সর্বাধিক প্রচারিত শিশু-কিশোর মাসিক

নতুন কিশোর কণ্ঠ

সেপ্টেম্বর ২০২০

মহাকবি কায়কোবাদ

এলোকেশে এলো হেসে শরৎ এ বঙ্গে

বিশ্ব মাঝে শীর্ষ হবো

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ড্রোন

গোয়েন্দা উপন্যাস গন্ধ-পাগল

বিচিত্র পাখি

ফ্লেমিঙ্গো

সর্বাধিক প্রচারিত শিশু-কিশোর মাসিক

নতুন কিশোরকণ্ঠ

বর্ষ ১৭ ■ সংখ্যা ৭

সেপ্টেম্বর ২০২০
আশ্বিন ১৪২৭
মহররম ১৪৪১

সম্পাদক
মোশাররফ হোসেন খান

নির্বাহী সম্পাদক
রাজিবুর রহমান

সহকারী সম্পাদক
মুমিনুল করিম
তোফাজ্জল হোসাইন
ওয়াহিদ জামান

দাম ২০ টাকা

কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে মতিউর রহমান আকন্দ কর্তৃক
৫১, ৫১/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং
হক প্রিন্টার্স, ২১০ ফকিরাপুল, মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ : নতুন কিশোরকণ্ঠ, ৫১, ৫১/এ (৭ম তলা),
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৫৬৭২৩৬
kishorkantha@yahoo.com
www.kishorkanthabd.com

নদীর তীরে, ঝরনাতলায়

আজ আবার নতুন করে বসেছে মুহসিনা আপুর গল্পের আসর। কুরআনের গল্প। মুনীরা বলল, আজ কিসের গল্প শোনোবে আপু? আপু বললেন, নদীর গল্প। ঝরনার গল্প। তবে পৃথিবীর নয়, জান্নাতের! আয়েশা, মালিহা সবাই বলল, তাহলে তো বেশ মজার গল্প হবে আজ! আপু বললেন, গল্প শুনতে হলে চুপ থাকতে হবে। একদম চুপ। মনোযোগ দিয়ে শোনো–

আল-কুরআনে জান্নাতের নদী ও ঝরনার কথা বারবার এসেছে। নদীর কথা এসেছে আল-কুরআনের ২২টি সূরার ৩৬টি আয়াতে। নদীগুলো জান্নাতের অট্টালিকা, কক্ষ ও উদ্যানসমূহের পাদদেশে প্রবাহিত। পৃথিবীর মতো জমিনের নিম্নভাগে নয়। এ নদীগুলোর উৎস হচ্ছে জান্নাতুল ফিরদাউস। সব নদীতেই রয়েছে 'পানীয়' কিন্তু তার সবই 'পানি' নয়। কোনোটিতে রয়েছে সফেদ দুধের ঢেউ, কোনোটিতে বিশুদ্ধ মধু, কোনোটিতে রয়েছে সুস্বাদু শারাব, কোনোটি আবার নির্মল পানির। জান্নাতের সবচেয়ে বড় নদীর নাম 'আল-কাউসার'।

আর জান্নাতের ঝরনাসমূহেরও রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নাম! একেক ঝরনার একেক বৈশিষ্ট্য। যেমন, এক ধরনের ঝরনা থাকবে কর্পূরমিশ্রিত। তবে তা দুনিয়ার কর্পূর নয়। এ কর্পূর ঘ্রাণযুক্ত। যাতে কোনো স্বাদ নেই। 'সালসাবিল' নামে আরেকটি ঝরনা আছে। এতে আছে আদার সুগন্ধ। 'তাসনিম' নামক জান্নাতের একটি ঝরনারও উল্লেখ রয়েছে আল-কুরআনে।

সাবিহা বলল, এগুলো কাদের জন্য আপু? আমরা কি এসব নদী ও ঝরনা থেকে পান করতে পারবো?

আপু বললেন, কেন নয়? তবে এর আগে আমাদের ভালো মানুষ হতে হবে। হতে হবে মুমিন। আল্লাহ বলেছেন, "যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন এমন জান্নাতের, যার পাদদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নদীসমূহ।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২৫) চলো, আমরা এখন থেকে ভালো ভালো কাজ করব। দূরে থাকব অন্যায় থেকে। তাহলেই পাবো জান্নাত। জান্নাতে আমরা ঘুরে বেড়াব নদীর তীরে, ঝরনাতলায়!

আনন্দে সবাই একসাথে বলে উঠল– ইনশাআল্লাহ!

– বিলাল হোসাইন নূরী

সুসংবাদ

জ্বর হলে কারই-বা ভালো লাগে। তখন তো সবকিছু স্বাদহীন। নীরস। তাহমীদেরও কয়েকদিন ধরে জ্বর। ভীষণ জ্বর! বারবার সে ভাবে, আহা! জ্বর না হয়ে যদি অন্য কিছু হতো! আচ্ছা, কবরে যদি শুধু একটু জ্বর থাকে– তা-ও তো সহ্য করা যাবে না! তাহলে কিভাবে মানুষ কবরের ভয়ানক আজাব ভোগ করবে! কিভাবে সে বসবাস করবে জাহান্নামের লেলিহান আগুনে! এসব ভাবতে ভাবতে সে আরও অস্থির হয়ে ওঠে। একা একা কথা বলে। কাঁদে।

সেদিন মাগরিবের পর, মা মাথায় পানি ঢালছেন। হাতের আঙুল দিয়ে চোখ দুটোতে আদর করছেন। আর বলছেন, এই তো বাবা! ভালো হয়ে যাবি তুই! মায়ের দোয়া আল্লাহ ফেরত দেন না। পরম মমতায় কবুল করে নেন। নাজিল করেন রহমত।

তাহমীদ কিছুটা শান্ত হয়। মায়ের কথায় মন ভরে ওঠে যেন। এমন সময় হঠাৎ করেই নানাভাই এসে উপস্থিত হন। তাহমীদকে দেখতে এসেছেন। নানাকে দেখে তাহমীদ আবার কেঁদে ওঠে। নানাভাই তার পাশে বসেন। কপালে হাত রেখে দোয়া পড়েন। এরপর বললেন, তোমার জন্য সুসংবাদ!

সুসংবাদ? কী সেই সুসংবাদ– জানতে চায় তাহমীদ। এমনকি তার মা-ও!

নানাভাই বললেন, একবার মহানবী (সা) একজন রোগী দেখতে গেলেন। যার ছিল জ্বর। মহানবী (সা) তাকে বললেন, "সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, দুনিয়াতে আমি মুমিন বান্দার ওপর আমার আগুন প্রবল করি এ কারণেই, যেন তা আখিরাতের আগুনের বিনিময় হয়ে যায়।" (আহমদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজি)। এখানে জ্বরকেই আগুন বলা হয়েছে। এ আগুন জাহান্নামের আগুনকে নিভিয়ে দেয়!

তাহমীদ চিৎকার করে বলে উঠল– সুবহানাল্লাহ! আরও বলল, নানাভাই আমার আর কোনো দুঃখ নেই। জ্বর যতই প্রবল হোক! নানাভাই তাহমীদের কপালে চুমু এঁকে দিলেন। ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলেন তার সারা বুক!

– বিলাল হোসাইন নূরী

বিচিত্র পাখি ফ্লেমিঙ্গো

জাহিদ ইকবাল ১২

এলোকেশে এলো হেসে শরৎ এ বঙ্গে

হারুন ইবনে শাহাদাত ২০

ধারাবাহিক গোয়েন্দা উপন্যাস

গন্ধ-পাগল

জুবায়ের হুসাইন ৪০

ছড়া-কবিতা
সোলায়মান আহসান ৮
মাহমুদুল হাসান নিজামী ১৯
নজমুল হক চৌধুরী ২৪
ছন্দা দাশ ৩২
মোরশেদা হক পাপিয়া ৩৬

স্মরণ
মহাকবি কায়কোবাদ : তাহসিন ফারজাদ ৯

ক্যারিয়ার গাইডলাইন
বিশ্ব মাঝে শীর্ষ হবো
আহসান হাবীব ইমরোজ ২৫

হাদিসের গল্প
সম্পদই সর্বনাশ করলো সা'লাবাকে
এস. এম রুহুল আমীন ৩৩

বিজ্ঞান ও বিশ্ব
বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ড্রোন : আল জাবির ৩৭

স্বপ্নমুখর জীবন
যত বড় ঝুঁকি তত বড় সাফল্য
আমিনুল ইসলাম ফারুক ৫৩

অনুবাদ গল্প
জাদুকর কন্যা : আল ফাতাহ মামুন ৬১

দেশ-মহাদেশ
ইউরোপের উন্নত দেশ ইতালি
মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ৬৮

খেলার চমক
বেন স্টোকস : সেরা অলরাউন্ডার
আবু আবদুল্লাহ ৮১

আইটি কর্নার
ফেসবুক রুম : লাইভ ব্রডকাস্টিং ফিচার
শরীফ তাজওয়ার ৮৮

তোমাদের ছড়া-কবিতা
সুলতানা জাকিয়া, আহমেদ রুমন ৬০
মুহিব্বুল্লাহ ফুয়াদ, মাহমুদ হায়াত ৬৭
শিমন রহমান, শ্যামলী বিনতে আমজাদ ৭৬
আরিফুল ইসলাম সাকিব ৮০
জগবন্ধু রায়, ঝুমা আক্তার ৮৭
শফিকুল আলম, আল আমিন মোহ ৯২

তোমাদের গল্প
পাখি পাকা পেঁপে খায় : জুয়েল আশরাফ ৭৭
বিনোদন : জান্নাতা নিঝুম শিল্পী ৯০
লোভী : সোহাগ তানভীর ৯৩

কুরআনের আলো ২, হাদিসের আলো ৩, আমাদের কথা ৫, অনুশীলন ৭
শব্দধাঁধা ৭, বলতে পারো ৩১, রংতুলি প্রতিযোগিতা ৯৬

আমাদের কথা

প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা,

আসসালামু আলাইকুম।

কেমন আছো তোমরা?

আশা করি সবাই ভালো আছো। সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো।

প্রতিবারই তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেই যে, করোনার এই কালে আমাদের অনেক বেশি সতর্ক থাকা জরুরি। আশা করি সবাই সতর্কতার সাথে নিরাপদে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছো। দোয়া করছি আল্লাহ যেন সবাইকে সুস্থ রাখেন, নিরাপদে রাখেন এবং সার্বিক কল্যাণ দান করেন।

প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা, করোনার জন্য স্কুল, কলেজ, মাদরাসাসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। কিন্তু তাই বলে প্রতিদিনের লেখাপড়া যেন ব্যাহত না হয়। প্রতিদিন নিয়মমাফিক রুটিন করে লেখাপড়ার কাজ চালিয়ে নিতে হবে এর মধ্য দিয়েই। আমরা যেন কোনোক্রমেই লেখাপড়ায় অবহেলা না করি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে আমরা যেন পিছিয়ে না পড়ি। এই বিষয়টি তোমরা খুব সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখবে এবং নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন লেখাপড়া করবে, বাসা-বাড়ির কাজে সহযোগিতা করবে, বিশ্রাম করবে, ব্যায়াম ও বিনোদনের জন্য কিছু সময় ব্যয় করবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকল সময় চেষ্টা তো করতেই হবে।

সকল কিছুই নিয়মমাফিক করতে হবে। তাহলেই কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করা যাবে।

ঋতু হিসাবে এটা শরৎকাল। শরৎ মানেই তো জানো যে প্রকৃতি কেমন সুন্দরভাবে সেজে ওঠে!

এই ঋতুটি শিউলি ফোটার দিন। আবার পাতা ঝরারও দিন। কবি কী সুন্দর করে বলেছেন– "শিউলির ডালে কুঁড়ি ভরে এলো / টগর জটিলো মেলা/ মালতি লতা খোঁজ নিয়ে যায় / মৌমাছি দুই বেলা।"

কবি আবার গভীর বেদনার সাথে বলছেন– শরৎ এলো। অতএব "পাতা খসানোর সময় হয়েছে শুরু!"

হ্যাঁ, শরৎকাল তো এমনই! শরৎকে বলা হয় ঋতুর রানী। কেন বলা হয়? একবার ভেবেই দেখো না! এ সময়ে আকাশে পেঁজা তুলোর মতো সাদা সাদা রূপালি মেঘ, সোনালি জোছনা, নিকেল করা বিকেল, পাখিদের কলকাকলিতে সরব গোধূলি, সাদা শুভ্র কাশফুলে কাশফুলে ভরে যায় নদীর দু'কূল। আহা কী মনোরম দৃশ্য!

হ্যাঁ বন্ধুরা, শরৎ তো এমনই মন মাতানো স্নিগ্ধ ভালোবাসা নিয়ে আসে আমাদের মাঝে এবং রেখে যায় তার সৌন্দর্যের গরিমা।

আমরা এই সংখ্যায় শরতের সেই বিচিত্র রূপ বৈচিত্র্যের ছোঁয়া কিছুটা রেখেছি কবিতা এবং নানাভাবে। ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি শরতের মাধুর্য। এ ছাড়াও আমাদের মাঝ থেকে প্রায় হারিয়ে যাওয়া মহাকবি কায়কোবাদকে আবারো স্মরণের পাদপীঠে নিয়ে এসেছি। সব মিলিয়ে আশা করি এই সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে। নিয়মিত বিভাগগুলোতে তোমরা আবারো স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে এটাই প্রত্যাশা করছি তোমাদের কাছে।

তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং সতর্ক থেকো।

তোমাদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

আল্লাহ হাফিজ। ■

স্বত্বাধিকারী

খাদেমুল হুজ্জাজ (মুয়াল্লিম)

আলহাজ্ব মাও: আবু শাকের মু. ইউনুছ

এম এম, এম. এ (ফার্স্ট ক্লাস)

মোবা: 01779 131243
01678 041243

হজ্ব এন্ট্রিতে যা লাগবে

এন. আই. ডি
মোবাইল নং
এন্ট্রি ফি

(১৪ দিনের)
ওমরাহ্
মক্কায় ৭ দিন
মদিনায় ৬ দিন

ওমরাহ্ প্যাকেজ মূল্য

ট্রানজিট ৮০,০০০/-
সরাসরি ৯০,০০০/-
৩ স্টার ১,২০,০০০/-
৫ স্টার ১,৫০,০০০/-

ATAB

Biman BANGLADESH AIRLINES

নির্ভূলভাবে হজ্ব ও ওমরাহ পালনে আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠান

কাবার পথে এভিয়েশন

অফিসঃ রহমানিয়া ইন্টাঃ কমপ্লেক্স, ৯ম তলা (রুম নং-১১)
২৮/১/সি টয়েনবী সার্কুলার রোড, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

01707 165527
01920 343506

অনুশীলন

প্রিয় বন্ধুরা,
আসসালামু আলাইকুম।
আশা করি ভালো এবং সুস্থ আছো। এবারও একটি কবিতার প্রথম অংশটি দেওয়া হলো। এর বাকি অংশটুকু লিখে দ্রুত পাঠিয়ে দাও। প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা আরও বেশি বেশি করে অনুশীলনে অংশগ্রহণ করবে।
আল্লাহ হাফিজ।
তোমাদেরই পরিচালক ভাইয়া।

সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসের ছড়া

"সব কথা তো যায় না বলা
সব পথেই তো যায় না চলা।
চারপাশে কালাপানির
ঢেউ ছলাৎ ছল,
ভাইটি যদি থাকতো পাশে
হয়তো পেতাম বল।"

শব্দধাঁধা

সেপ্টেম্বর ২০২০ সংখ্যার শব্দধাঁধা

১		২	■	৩		৪
	■		■	■	■	
৫		■	■	৬		
	■	৭		■	■	
■	■		■	৮		
৯			■		■	■
	■	■	■	১০		১১
১২		■	১৩		■	

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি : ১. সুখ, আয়েশ, বিশ্রাম ৩. একটি সূরার নাম ৫. বাতিল, ভঙ্গ ৬. প্রথম মানুষ ও নবী ৭. প্রথম, শুরু, মূল ৮. স্বচালিত ৯. তরুণ, teen-ager ১০. পা, চরণ, পদচিহ্ন ১২. তটিনী ১৩. কম।

উপর-নিচ : ১. একটি ফল ২ ডেঙ্গু ৪. বর্ষা মানেই যে ফুল ৭. বৈঠক, মজলিস ৮. প্রতিজ্ঞা, শপথ, ৯. আলো ১১. প্রাচীন মিসরে বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত মরদেহ।

জুন ২০২০ সংখ্যার সমাধান

মি	র	জা	ফ	র	■
র	■	কা	■	জ	বা
পু	■	র্তা	■	নি	■
র	ব	■	রো	■	কা
■	ই	■	খা	ন	কা
পা	■	■	■	বা	■
প	লা	শী	দি	ব	স

শরৎ-খেলা

সোলায়মান আহসান

আকাশ পাতে মেঘের ভেলা যায় চলে যায় ভেসে
যেথায় থাকে রাজপুত্তুর অবুঝ ভালোবেসে
মনটা তার উড়ু উড়ু ঘরে থাকতে চায় না,
তেপান্তরে ছুট দেবে সে স্বাধীনতা পায় না।

ঘরের কোণে আরশি ধারে দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়
সবাই ডাকে আয় না খোকা-আয় না কাছে আয়!
কি আর করা, খোকন সোনা মেঘের দলে ভিড়ে
যায় হারিয়ে চুপটি করে-ফিরবে না আর নীড়ে।

ভাবনা নিয়ে ঘর ছেড়েছে বন-পাহাড়ে জুড়ি
ভালোবাসি ভালোবাসি-বলল পাথর-নুড়ি!
মাঠের পাখি দুষ্টু বক নেয় না খেলার সাথী
যায় উড়ে যায় দূর আকাশে, খুঁজছে আতিপাতি।

টেলিফোনের তারে বসে ফিঙ্গেরা খায় দোল।
শালিখগুলোর কিচির-মিচির বিদঘুটে সব বোল
ভাল্লাগেনা বিকেল গড়ায় সন্ধ্যা মণি এলো
ঝম ঝমা ঝম বিষ্টি নেমে করলো এলোমেলো।

এই যে বিষ্টি এই যে রোদ লুকোচুরি খেলা
শরৎকালের মিষ্টি-মধুর পসরা সাজায় মেলা।

স্মরণ

মহাকবি কায়কোবাদ

তাহসিন ফারজাদ

কায়কোবাদ তাঁর লেখক নাম। আসল নাম কাজেম আল কোরায়শী। তিনি একজন কবি। তিনি মহাকবি। তিনি বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম সনেট রচনা করেন। রচনা করেন প্রথম মহাকাব্য। এটি মজার বিষয় বটে। তার জন্ম ১৮৫৭ সালে। ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানায়। গ্রামের নাম আগলা-পূর্বাপাড়া।

কায়কোবাদ লেখাপড়া করেন সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে। খুব অল্প বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর তিনি ঢাকা মাদরাসায় ভর্তি হন। যা এখন কবি নজরুল সরকারি কলেজ। এখানে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ তাঁর হয়নি। কিংবা দিতে পারেননি। যেহেতু অল্প বয়সে পিতা মারা গেছেন ফলে জীবনে অভাবের মুখোমুখি হন। প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিয়ে একটি চাকরিতে যোগ দেন তিনি। চাকরিটি ছিল পোস্ট মাস্টারের। তাঁর গ্রামেই ছিলো এর অফিস। তিনি লেখাপড়া ছেড়ে পোস্ট মাস্টারের চাকরি নিয়ে ফিরলেন তাঁর নিজ গ্রামেই। এই চাকরি থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

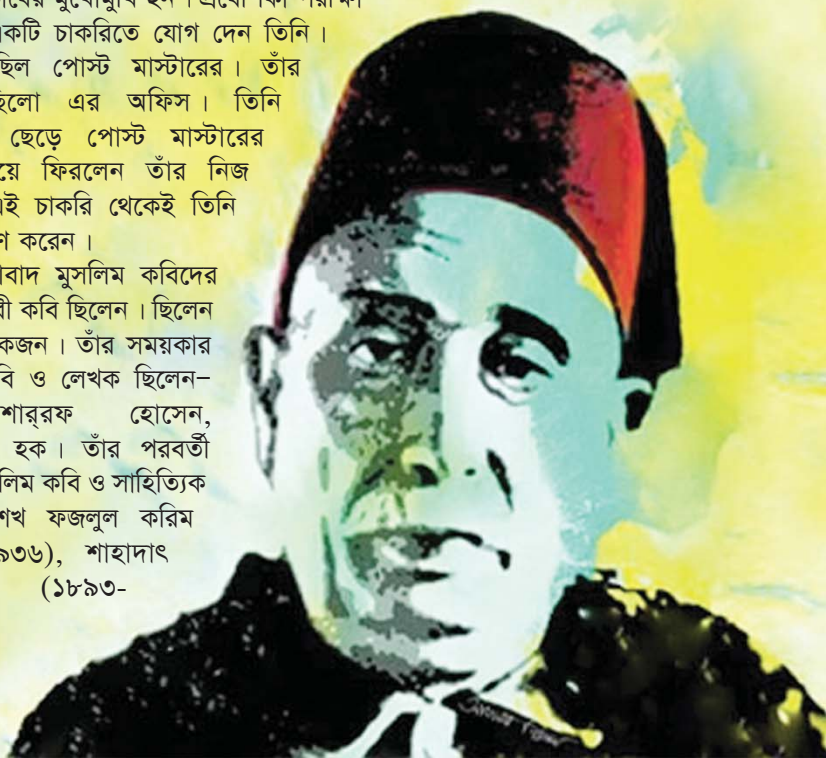

কায়কোবাদ মুসলিম কবিদের মধ্যে মেধাবী কবি ছিলেন। ছিলেন অগ্রগণ্য একজন। তাঁর সময়কার মুসলিম কবি ও লেখক ছিলেন– মীর মশার্‌রফ হোসেন, মোজাম্মেল হক। তাঁর পরবর্তী কয়জন মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক হলেন– শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬), শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-

১৯৫৩), প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), কাজী আব্দুল ওয়াদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল মনসুর আহমেদ (১৮৯৮-১৯৭৮), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), মোহাম্মদ নজিবর রহমান (১৮৭৮-১৯২৩), মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৬), আবুল ফজল (১৯০৫-১৯৮১), আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৫) । এসব কবি সাহিত্যিকগণ প্রত্যেকেই তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী সাহিত্য রচনা করেন । এদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম সকলকে ছাপিয়ে হয়ে যান সেরা থেকে আরও সেরা ।

যে নামগুলো আমরা জানলাম এদের কেউ মহাকাব্য রচনা করেননি । কায়কোবাদ রচনা করেছেন বলেই তিনি মহাকবি । তাঁর মহাকাব্যের নাম- 'মহাশ্মশান ।' আরেকটি কাব্যগ্রন্থ তাঁর । নাম– 'মহররম শরীফ' । এটিকে বলা হয় কাহিনী কাব্য । মূলত এটিও একটি মহাকাব্য ।

কায়কোবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ– 'বিরহ বিলাপ ।' এটি প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে । তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৩ বছর । এত কম বয়সে বের হয় তাঁর কবিতার বই । তাঁর বাকি গ্রন্থগুলোর নাম– কুসুম কানন, অশ্রুমালা, শিব মন্দির, অমিয় ধারা, শ্মশান ভস্ম, শ্মশান ভসন, প্রেমের রাণী, প্রেম পারিজাত ইত্যাদি । এই মেধাবী কবি তার সময়ে বেশ সুনাম কুড়ান । তাঁর খ্যাতি তাঁকে দিয়েছে অনেক সম্মান । তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও মুসলিম কবি যাঁকে ১৯২৫ সালে নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ 'কাব্যভূষণ',

আযান নিয়ে কায়কোবাদের মতো এমন আনন্দময় ও প্রাণস্পর্শী কবিতা আর কোনো কবি লেখেননি

'বিদ্যাভূষণ', ও 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি দেন । খুব মজার এবং অসাধারণ কিছু কবিতা রচনা করেন তিনি । তাঁর কবিতায় মুসলমানদের বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে । আছে মুসলমানদের ঐতিহ্য । আছে চেতনা । জীবনের নানান সৌন্দর্যের চিত্র আছে তাঁর কবিতায় । প্রকৃতির বর্ণনা আছে দারুণভাবে । তিনি মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে লিখেছেন । লিখেছেন মানুষের সম্পর্ক নিয়ে । সত্য ও ন্যায়ের কথা আছে তাঁর কবিতায় ।

তাঁর একটি কবিতার নাম– 'প্রার্থনা' । এই কবিতায় তিনি মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছেন ।

তোমার দুয়ারে আজি রিক্ত হস্তে দাঁড়ায়েছি প্রভু
সঁপিতে তোমারে শুধু আঁখি জল
দেহ হৃদে বল ।

একজন বিশ্বাসী মানুষ রবের কাছে নিজেকে সঁপে দেন । বলেন– আমি নিঃস্ব, আমি অসহায় । আমাকে সাহায্য করো । আমাকে দয়া করো । তেমনি কায়কোবাদ তাঁর প্রার্থনা কবিতায় নিজেকে সঁপে দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালার দরবারে । চোখের অশ্রু দিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছেন তিনি ।

কায়কোবাদ আমাদের কাছে সব থেকে বেশি পরিচিত একটি কবিতা দিয়ে ।

কবিতাটির নাম– 'আযান' । এটি কায়কোবাদের বিপুল পরিচিত কবিতা । সবচেয়ে বেশি পঠিত কবিতা । কায়কোবাদ নামের সাথে জড়িয়ে আছে আযান কবিতাটি । আযান নিয়ে কায়কোবাদের মতো এমন আনন্দময় ও প্রাণস্পর্শী কবিতা আর কোনো কবি লেখেননি । কায়কোবাদের এ কবিতাটি পাঠ করলেই বোঝা যায় কী মধুময় বাণী আছে কবিতায় । প্রাণ ছুঁয়ে যাওয়ার মতো কথামালা । হৃদয় আলোড়িত হয় । মন নেচে ওঠে । বিশ্বাস দৃঢ় হয় । পাঠ করা যাক কবিতাটি–

কে ওই শোনালো মোরে আযানের ধ্বনি
মর্মে মর্মে সেই সুর, বাজিল কী সুমধুর
আকুল হইলো প্রাণ নাচিলো ধমনি
কী মধুর আযানের ধ্বনি ।

আমি তো পাগল হয়ে সে মধুর তানে
কী যে এক আকর্ষণে, ছুটে যাই মুগ্ধ মনে
কী নিশিথে কী দিবসে মসজিদের পানে ।

হৃদয়ের তারে তারে, প্রাণের শোণিত ধারে
কী যে এক ঢেউ ওঠে ভক্তির তুফানে
কত সুধা আছে সেই মধুর আযানে ।

নদী ও পাখির গানে, তারই প্রতিধ্বনি
ভ্রমরের গুণগানে, সেই সুর আসে কানে
কী এক আবেশে মুগ্ধ নিখিল ধরণী ।

ভূধরে, সাগরে জলে নির্ঝরণী কলকলে
আমি যেনো শুনি সেই আযানের ধ্বনি ।
আহা যবে সেই সুর সুমধুর স্বরে
ভাসে দূরে সায়াহ্নের নিথর অম্বরে ।
প্রাণ করে আনচান, কি মধুর সে আযান
তারি প্রতিধ্বনি শুনি আত্মার ভেতরে ।

নীরব নিঝুম ধরা, বিশ্বে যেনো সবই মরা
এতটুকু শব্দ যবে নাহি কোনো স্থানে
মুয়ায্যিন উচ্চঃস্বরে দাঁড়ায়ে মিনার পরে
কি সুধা ছড়িয়ে দেয় উষার আযানে ।
জাগাইতে মোহমুগ্ধ মানব সন্তানে
আহা কি মধুর সেই আযানের ধ্বনি ।

কী যে মায়াবী শব্দ দিয়ে কবিতাটি লিখেছেন তিনি । লিখেছেন হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে ।

তানজানিয়ার নাট্রোন হ্রদে বিশ্বের ৭৫ শতাংশ ফ্লেমিঙ্গোর বিচরণ

বিচিত্র পাখি
ফ্লেমিঙ্গো

জাহিদ ইকবাল

প্রচ্ছদ রচনা

উজ্জ্বল কমলা বর্ণের পালকের জন্য ফ্লেমিঙ্গোরা পৃথিবীব্যাপী সবচেয়ে সুন্দর পাখিদের মধ্যে অন্যতম। ফ্লেমিঙ্গোদের উজ্জ্বল গায়ের রং পাখিদের দুনিয়ায় এক অপূর্ব সৌন্দর্যের প্রতীক।

এরা অগভীর জলাভূমি, উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ জলাভূমি এবং বালুময় দ্বীপের তীরে চরে বেড়াতে পছন্দ করে। ক্যালিবিয়ান ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ফ্লেমিঙ্গো পাওয়া যায়।

ফ্লেমিঙ্গো শব্দটি স্পেনীয় এবং লাতিন শব্দ ফ্ল্যামেনকো থেকে এসেছে। যার অর্থ আগুন। পাখিটির পালকের উজ্জ্বল বর্ণের জন্যই এমন নাম। তবে সব ফ্লেমিঙ্গো উজ্জ্বল বর্ণের নয়। কিছু কিছু পাখি ধূসর বা সাদা। অল্প বয়স্ক পাখিরও কম রঙ থাকে।

বিশ্বে মাত্র ছয়টি প্রজাতির ফ্লেমিঙ্গো রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি প্রজাতির উপ-প্রজাতি রয়েছে।

ফ্লেমিঙ্গোর পা সরু ও লম্বা, নিম্নমুখী ঠোঁট, লেজ খাটো, গলা লম্বা

ও বক্রাকার। এদের উচ্চতা ৯০ থেকে ১৫০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। ওজন প্রায় ৪.৫ কিলোগ্রাম পর্যন্ত। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এদের সবার শরীরের কিছু অংশ গোলাপি বর্ণ ধারণ করে। এরা ৬০ কিলোমিটার বেগে একটানা প্রায় ৫০০ কিলোমিটার উড়ে নিজের বাসস্থানে পৌঁছাতে পারে।

এই সুন্দর পাখিটি তাদের জীবনের ২০ শতাংশ সময় ব্যয় করে তাদের পালক পরিষ্কার করতে, কারণ এদের বিশেষ একটি গ্রন্থী থাকে যা থাকে তৈল নিঃসৃত হয় এবং ঠোঁটের মাধ্যমে তারা এই তৈলকে সর্বাঙ্গের পালকে ছড়িয়ে দেয়।

সাধারণত এই পাখিরা কলোনি হয়ে

এরা বছরে মাত্র একটি ডিম দিয়ে থাকে

বসবাস করে। প্রতিটি কলোনি এতোটাই বড় হয় যে, অনেক সময় দশ লক্ষাধিক পাখি একই কলোনিতে বসবাস করতে দেখা যায়।

এরা মনোগেমাস অর্থাৎ সারা জীবন এদের একটি মাত্র সঙ্গী থাকে। এরা বছরে মাত্র একটি ডিম দিয়ে থাকে। পুরুষ এবং নারী দুজন মিলেই ডিমে তা দেয় এবং ডিম থেকে বাচ্চা বের হাওয়ার সাথে সাথে নারী-পুরুষ যৌথভাবে বাচ্চাকে লালন-পালনের দায়িত্ব নেয়।

জন্মের সময় এদের পালক সাদা থাকে

যদি ফ্লেমিঙ্গো শিকারি দ্বারা বা কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়, তবে এদের সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পেতে কয়েক বছর সময় নিতে পারে।

জন্মের সময় এদের পালকের রং সাদা বর্ণের হয়। এরা গোলাপি, কমলা বা লাল রঙ হওয়ার জন্য তিন বছর সময় লাগে।

ফ্লেমিঙ্গোদের জীবনের প্রথম দিকে বাঁকানো ঠোঁট থাকে না, বয়স বাড়ার সাথে সাথে এদের ঠোঁট নিচের দিকে বেঁকে যেতে থাকে।

ফ্লেমিঙ্গো তাদের খাবারগুলোকে ফিল্টার করতে পারে। তারা শৈবাল, উদ্ভিদ উপাদান, পোকা-মাকড়, ব্রাইন চিংড়িসহ নানা ধরনের খাবার খেয়ে থাকে।

ফ্লেমিঙ্গোর গায়ে কমলা রং ধারণ করার পেছনে আছে এক বিশেষ কারণ। কারণটা হচ্ছে এদের খাদ্যাভ্যাস! ফ্লেমিঙ্গোরা সাধারণত সামুদ্রিক চিংড়ি এবং নিলাভ-সবুজ অ্যালজি খেয়ে থাকে, যেগুলোতে প্রচুর পরিমাণ কমলা রঙের স্যান্থাজ্যান্থিন নামক প্রাকৃতিক রং থাকে। মূলত এই প্রাকৃতিক রঙের প্রভাবেই এরা উজ্জ্বল কমলা রং ধারণ করে।

তবে চিড়িয়াখানায় রাখলে এদের রং পাল্টে সাদা হয়ে যায়। এ জন্য চিড়িয়াখানায় এদের রং ধরে রাখতে খাবারের সাথে কৃত্রিমভাবে স্যান্থাজ্যান্থিন মেশানো হয়।

ফ্লেমিঙ্গোদের একটি বিশেষ গুণ এরা

বেশির ভাগ সময় এক পায়েই দাঁড়িয়ে থাকে। ফ্লেমিঙ্গোরা যদি দু'পায়ের বদলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তারা বেশি শক্তি সাশ্রয় করতে পারে। এটা বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করেছেন।

এটাকে এক রকম তাদের সিগন্যাচার পোজ বলেই ধরা যায়, যদিও কেন তারা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সেটা বহুদিন ধরেই একটা রহস্য হয়ে ছিল।

কোনও কোনও গবেষকের ধারণা ছিল, শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই বোধ হয় ফ্লেমিঙ্গোরা এক পায়ে দাঁড়ায়।

এখন আমেরিকার একদল বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকলে ফ্লেমিঙ্গোদের আলাদাভাবে সক্রিয় কোনও পেশিশক্তি খরচ করতে হয় না- ফলে তাতে তাদের এনার্জিও কম খরচ হয়।

আগে বিজ্ঞানীরা ভাবতেন, যেহেতু একপায়ে দাঁড়ানোর সময় ফ্লেমিঙ্গোরা একটু পরপর পা বদলায়, তাই বোধ হয় তারা মাসল ফ্যাটিগ বা পেশির ক্লান্তি কাটানোর জন্যই এমনটা করে।

আটলান্টার জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক ইয়ং-হুই চ্যাং এবং আটলান্টার এমোরি ইউনিভার্সিটির লেনা এইচ টিং ফ্লেমিঙ্গোর এই এক পায়ে খাড়া থাকার পেছনে মেকানিক্যাল রহস্যটা উদ্ধার করেছেন।

ফ্লেমিঙ্গোরা একা থাকতে ভালোবাসে না। ঝাঁক বেঁধে বিষাক্ত হ্রদে থাকাটা তাদের জন্য আরামদায়ক

এই গবেষকরা তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন জীবিত ও মৃত, দু'ধরনের ফ্লেমিঙ্গো নিয়েই।

আশ্চর্যজনকভাবে তারা দেখেছেন, একটা মৃত ফ্লেমিঙ্গোকেও বাইরের কোনও সাহায্য ছাড়াই এক পায়ে খাড়া করে দাঁড় করানো সম্ভব।

রয়্যাল সোসাইটি জার্নাল বায়োলজি লেটার্সে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে তারা এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'প্যাসিভ গ্র্যাভিটেশনাল স্টে মেকানিজম'।

ফ্লেমিঙ্গোরা সাধারণত ২০-৩০ বছর বেঁচে থাকে। তবে চিড়িয়াখানায় ৫০ বছর বা তার বেশি সময় বেঁচে থাকার রেকর্ড রয়েছে। বন্দী ফ্লেমিঙ্গো সাধারণত বেশি দিন বাঁচে কারণ তাদের কেউ শিকার করতে পারে না আবার এখানে পশুচিকিৎসা, যত্ন এবং প্রচুর খাদ্যের ব্যবস্থা থাকে।

ফ্লেমিঙ্গোর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় এদের আফ্রিকার তানজানিয়ার নাট্রোন হ্রদে বিচরণ। বিশ্বের ৭৫ শতাংশ ফ্লেমিঙ্গোর দেখা মেলে এখানে। প্রায় ৩ দশমিক ২ মিলিয়ন ফ্লেমিঙ্গো বাস করে তানজানিয়ার এই বিষাক্ত হ্রদে।

এই হ্রদের পানি এত বিষাক্ত যে, মানুষের চামড়া এতে গলে যায়। অন্যান্য প্রাণীও এ হ্রদে বাস করে না। কিন্তু কোনো এক কারণে ফ্লেমিঙ্গোরা এ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। এখন এই হ্রদ হুমকির মুখে।

তানজানিয়ার কস্টিক সোডা মিশ্রিত হ্রদ ও অতিরিক্ত লবণাক্ত হ্রদগুলোতে এ পাখি নিজেদের শান্তির আবাস বানিয়ে নিয়েছে। আফ্রিকার গ্রেট রিফট

আফ্রিকার গ্রেট রিফট উপত্যকার ক্ষারীয় পানির হ্রদে খুদে নীল-সবুজ শৈবাল পাওয়া যায়; যা খেয়ে এ পাখি বেঁচে থাকে

উপত্যকার ক্ষারীয় পানির হ্রদে খুদে নীল-সবুজ শৈবাল পাওয়া যায়; যা খেয়ে এ পাখি বেঁচে থাকে। কিন্তু বিষাক্ত এ শৈবাল প্রচুর ক্ষতিকর রাসায়নিক উৎপাদন করে থাকে, যা কোনো প্রাণীর পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়। কিন্তু ফ্লেমিঙ্গোরা তা অনায়াসে খেয়ে জীবনধারণ করছে। যদিও এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তাদের বর্ণিল পাখার মধ্যেই দেখা যায়। অর্থাৎ গোলাপি রঙের পালকের মূলে এই বিষাক্ত শৈবালের বিষক্রিয়া।

ফ্লেমিঙ্গোর অতিরিক্ত রুক্ষ চামড়া এবং শরীরের আঁশ তাদেরকে বিষাক্ত পানির জ্বালা-পোড়া থেকে বাঁচায়।

কাছাকাছি উষ্ণ পানির ঝরনা থেকে তারা সাধারণত পানি সংগ্রহ করে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে লবণাক্ত পানিই তাদের ভরসা।

ফ্লেমিঙ্গোর মাথার কাছের গ্রন্থী অতিরিক্ত লবণ পাকস্থলীতে যাওয়ার আগে শুষে নেয় এবং তাদের নাকের গর্ত দিয়ে বের করে দেয়। খুব কম প্রাণী এ পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে চলার ক্ষমতা রাখে। ফলে বেঁচে থাকার জন্য ফ্লেমিঙ্গোকে প্রতিযোগিতা খুব কম করতে হয়।

ফ্লেমিঙ্গোরা একা থাকতে ভালোবাসে না। ঝাঁক বেঁধে বিষাক্ত হ্রদে থাকাটা তাদের জন্য আরামদায়ক। কিন্তু এ ধরনের লবণাক্ত হ্রদের সংখ্যা খুবই কম। পরিবেশ দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় তাদের বসবাসের জায়গা হুমকির মুখে। প্রতি বছরই ফ্লেমিঙ্গোর সংখ্যা কমে আসছে। হ্রদগুলো থেকে সোডিয়াম কার্বোনেট বের করে নেয়ার ফলে হুমকির মুখে পড়ছে বৈচিত্র্যময় এ প্রজাতি।

বনভোজন

মাহমুদুল হাসান নিজামী

বনের মানুষ বনই ভালো
বনের মাঝে আমন্ত্রণ
হই হুল্লোড় সবাই মিলে
চড়ুইভাতি বনভোজন ।

কালা-পাহাড় রাঙ্গামাটি
নীলগিরি-বান্দরবান
বনের মায়ায় মন ছুটে যায়
সেগুনতলায় সারাক্ষণ ।

কে যাবে রে বনভোজনে
মন সোহাগী ছুটে যায়
বনের মানুষ বনের মাঝে
চড়ুইভাতি লুটে খায় ।

ফিচার

এলোকেশে এলো হেসে শরৎ এ বঙ্গে

হারুন ইবনে শাহাদাত

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। অপরূপ সুন্দর এই দেশ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। বারো মাস আর ছয় ঋতুর এই দেশ। প্রতিটি ঋতুতেই এ দেশের প্রকৃতি সাজে নতুন নতুন রূপ আর রঙে। বারো মাসের পরিক্রমায় আশ্বিন ও ভাদ্র এই দুই মাস মিলে শরৎকাল। বর্ষা আর শীতের মাঝামাঝি এই ঋতুর উষ্ণতা আর শীতলতার পরশ, আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, নদীর তীরে কাশফুল, বাড়ির আঙিনা ও বাগানের শিউলি ও বেলি ফুল সবার মনে শুভ্রতার পরশ ছড়ায়। প্রকৃতির এই শুভ্র সুন্দর রূপে মন হয় পুলকিত। এই সৌন্দর্যের স্রষ্টার স্মরণে হয় আপ্লুত। কবি শেখ ফজলুল করিমের ভাষায়, 'ফুলকুল তুলতুল গা ভেজা শিশিরে,/ বুলবুল মশগুল কার গান

গাহিরে। / তড়বড় উঠে পড় রাতভোর দেখ না,/ হাত তুলে প্রাণ খুলে স্রষ্টারে ডাক না।/ ঝাঁকঝাঁক মৌমাছি মৌচাকে বিহরে,/ কলিগুলি দুলিদুলি স্বপনেতে শিহরে।/ ঝিকমিক দশদিক নাই পিক পাপিয়া,/সাদা বক চকচক উড়ে যায় ডাকিয়া।/ বিলঝিল খিলখিল লাল নীল বরণে,/ গাছে গাছে ফিঙ্গে নাচে চঞ্চল চরণে।/ ভেজাভেজা তাজাতাজা শেফালীর সুবাসে,/ শিশুদল কোলাহল করে নানা হরষে।/ কাশবন শনশন বেনু বাজে পাথারে,/ লঘুমেঘ ধরি বেশ ভেসে যায় পাহাড়ে।/ টুনটুনি সোনামণি স্ফূর্তির ফোয়ারা,/ মনভাঙ্গা মাছরাঙ্গা দেখ তার চেহারা। / বুটিদার জড়িপাড় শ্যাম-শাড়ী অঙ্গে/এলোকেশে এলো হেসে শরৎ এ বঙ্গে।'

কবি বঙ্গ বা বাংলাদেশের শরতের রূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শুধু বঙ্গদেশে নয় পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই শরৎকাল আছে। অনেক দেশেই আমাদের দেশের মতো ছয়টি ঋতু নেই। মাত্র চারটি ঋতু। সেসব দেশেও প্রধান ঋতুর একটি হচ্ছে শরৎ। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'অটাম'। ঈসায়ী বর্ষপঞ্জি অনুসারে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে সেপ্টেম্বর মাসে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে মার্চ মাসে শরৎকাল গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের মধ্যবর্তী ঋতু। উত্তর আমেরিকানরা শরৎকালকে 'Fall' অর্থাৎ "ঝরেপড়া" বা "পতন" বলে ডাকে। কারণ এই সময় গাছপালার পাতা ঝরে পড়ে। আমাদের বাংলাদেশে শরৎকালের আগমন ঘটে ভিন্ন রূপে। শিশির আর কুয়াশার সাথে সকালে রোদের মিতালি এদেশের প্রকৃতিকে আরো অপরূপ করে তোলে। শিউলি ফুল রাতে ফোটে ও সকালে ঝরে পড়ে। জাফরানি বোঁটার দুধসাদা ছয় পাপড়ির

শিউলি ফুল সবুজ ঘাসের ওপর পড়ে। তার ওপর ভোরের সূর্যের আলো সত্যি অপরূপ। বর্ষায় ঘ্রাণ ছড়ানো বেলি ফুলের মৌ মৌ সুবাস শরতের রাতেও পাওয়া যায়। বর্ষার ফুল দোলনচাঁপাও শরৎকালে এখনো আছে ঝরে পড়ে না। ফুল, ফল আর ফসলের এই দেশে শরতে আরো অনেক ফুলের মেলা বসে। নদীর তীরে হাসি ছড়ানো কাশবন আর বাড়ির বাগান কিংবা আঙিনায় ফোটা বেলি, জুঁইয়ের কথা তো আগেই বলেছি। এ ছাড়াও শরতে শাপলা, শালুক, পদ্ম, কেয়া, জবা, কামিনী, মালতি, মল্লিকা, মাধবী, ছাতিম ফুল, বরই ফুল ও জারুল, নয়নতারা, ধুতরা, ঝিঙে, জয়ন্ত্রী, শ্বেতকাঞ্চন, সোনালিকা, স্থলপদ্মা, বোগেনভেলিয়াসহ নানা রকমের কত ফুল হেসে ওঠে এই বাংলাদেশে।

খাল-বিল, নদী ভরা মাছ আর মাঠ ভরা ফসলের ঋতু শরৎ। এই ঋতুর পরের ঋতু হেমন্তকালে সোনালি ফসলে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে নবান্নের উৎসব হয়। আর ফসলের সবুজ সমারোহ থাকে শরৎকালের মাঠে মাঠে। এ যেন নবান্নের আগমনী বার্তা। কৃষকের যত্নের ছোঁয়ায় বাতাসে মাঠে মাঠে ঢেউ খেলে সবুজ ফসল।

শরতের আগের ঋতু বর্ষা। শরৎ এলে পানি কমতে থাকে। তখন খাল, বিল, নদী-নালায় মাছ ধরার উৎসব চলে। কই, শিং, মাগুর, পাবদা, পুঁটি, বোয়াল, শোল, টেংরা, বৌ, চিংড়ি, খইসা, চাটা, মলা, কানডানা মাছে ভরা থাকে বাংলাদেশের জলাশয়গুলো। ছোট ছোট এই সব মাছের সাথে রুই, কাতলা, আইড়, বাঘাইড়সহ নানান স্বাদের দেশি মাছ তখন পাওয়া যায় খুব সহজেই। প্রকৃতির রূপ-রঙের ছোঁয়া নিবিড় করে পেতে তখন অনেকেই চলে যান গ্রামের বাড়ি। কারণ কাশফুল, সাদা মেঘের ভেলা আর শিশির ভেজা শিউলি-বেলির ঘ্রাণ গাঁয়ের অকৃত্রিম পরিবেশে যেমন করে পাওয়া যায়, ইট-পাথরের নগরে তেমনটা পাওয়া যায় না।

নানান ধর্ম-বর্ণের মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনে করছে বসবাস এদেশে। প্রতি শরতে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা মহাধুমধাম করে উদযাপন করে তাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। শরৎকালের আশ্বিন মাসের

শরৎ এলে খাল, বিল, নদী-নালায় চলে মাছ ধরার উৎসব

শরতে নানা রকমের ফুল হেসে ওঠে

দুর্গাপূজাকে বলা হয় শারদীয়া দুর্গাপূজা। অবশ্য এছাড়াও চৈত্র মাসের দুর্গাপূজা হয়। সেই পূজা বাসন্তী দুর্গাপূজা নামে পরিচিত। কিন্তু শারদীয়া দুর্গাপূজার জনপ্রিয়তাই বেশি। বাসন্তী দুর্গাপূজা পারিবারিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে তাই শরৎকাল মানে এক নতুন মাত্রা। তারা শুধু সৌন্দর্য নয়, ধর্মীয় উৎসবের ঋতুও মনে করে শরৎকে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলাম ধর্মের অনুসারীর এই দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝে খুঁজে পায় মহান আল্লাহর অপার মহিমা। প্রতিটি ঋতুর সৌন্দর্য অবলোকন করে তারা ঈমানের আলোয় দীপ্তমান হয়। তাদের মনে পড়ে পবিত্র কুরআনের এই বাণী, 'দয়াময় স্রষ্টার সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। তোমার দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখ, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি? আবার দেখ; আবারও। তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আমারই দিকে ফিরে আসবে।' (সূরা মুলক ৩-৪) সুনীল আকাশের সাদা মেঘের ভেলা দেখলে মনে পড়ে, 'তারা কি নভোমণ্ডলের প্রতি দেখে না, কিভাবে তিনি তা বানিয়েছেন, সুশোভিত করেছেন? আর নেই তাতে কোনো স্তম্ভ।' (সূরা কাহাফ ৬) মনের ভেতর অনুরণন তুলে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গীতিকবিতার এই পঙক্তিমালা, 'তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর,/ না জানি, তাহলে তুমি,/ কত সুন্দর! কত সুন্দর!/ সেই কথা ভেবে ভেবে/ সেই কথা ভেবে ভেবে/ কেটে যায় লগ্ন,/ ভরে যায় তৃষিত এ অন্তর।/ না জানি, তাহলে তুমি,/কত সুন্দর! কত সুন্দর!'

ঋতুর ছড়া

নজমুল হক চৌধুরী

প্রকৃতিটা কত রূপে কত রঙে সাজে
রকমারি রূপ আসে আমাদের মাঝে
ষড়ঋতুর এই দেশে এই মা ও মাটি
প্রকৃতিটা সাজিয়েছে কত পরিপাটি ।

বৈশাখ মাস আনে গ্রীষ্মকে ডেকে
আম, জাম যায় পেকে তীব্রতা থেকে
জ্যৈষ্ঠ মাসে তার বিদায়ের পালা
কালো ঝড় এসে তাই করে ঝালাপালা ।

আষাঢ়-শ্রাবণ আসে বর্ষাকে নিয়ে
শুষ্কতা মুছে যায় বৃষ্টিতে গিয়ে
খাল-বিল, মাঠে থাকে পানি আর পানি
তরী দিয়ে তাই করে সব জানাজানি ।

ভাদ্র ও আশ্বিনে শরতের ফুলে
কাশবন ছেয়ে যায় যেন তুলতুলে
মাঠে মাঠে ধান চাষ করে যায় চাষি
হেমন্ত এলে তাই মুখে ফুটে হাসি ।

কার্তিক মাসে গাঁয়ে কৃষকের ঘরে
স্বর্ণালি ধানে তার ঘর যায় ভরে
অঘ্রাণে এলে ভাই কৃষকের দলে
'নবান্ন উৎসবে' তারা যায় চলে ।

পৌষ ও মাঘে আসে অতিথি এ পাখি
শীতকালে এসে তারা করে ডাকাডাকি
সরিষার ক্ষেতে যতো ফুলগুলো ফুটে
বারবার মন যায় সেইখানে ছুটে ।

ফাল্গুন- চৈতিরা মিলে দুই মাসে
ঋতুরাজ বসন্ত বাংলায় আসে
শিমুলের ফুল ফুটে হাসে গাছে গাছে
এইভাবে আসে ঋতু আমাদের কাছে ।

ক্যারিয়ার গাইডলাইন

বিশ্ব মাঝে শীর্ষ হবো

আহসান হাবীব ইমরোজ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

কিশোরকণ্ঠের সুপ্রিয় বন্ধুরা, নিয়মমাফিক জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কেমন আছ?

তোমরা সবাই জান, আমরা এই ধূসর পৃথিবীর অধিবাসীরা ইতিহাসের এক কঠিন ক্রান্তিকাল পাড়ি দিচ্ছি। যাকে সবাই আদর (?) করে নাম দিয়েছে করোনা-কাল। প্রায় দেড় কোটি মানুষ এতে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর ৬ লক্ষ ৩০ হাজার বনি আদম ইতোমধ্যেই পরকালে পাড়ি জমিয়েছেন। আমরা নিজেদেরসহ সবার জন্য দোয়া করছি, পরম-প্রভু যেন আমাদের ক্ষমা এবং হেফাজত করেন।

এর মাঝেই আমাদের পড়ালেখা, পরিবারকে সহযোগিতা এবং আত্ম-উন্নয়নসহ সকল জরুরি কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তবে অবশ্যই তা নিয়ম মেনে এবং ঠাণ্ডা মাথায়। কেননা একটি কথা আছে না, 'রাগলেনতো হেরে গেলেন'।

কিছু গল্প শেয়ার করা যাক, কিছুটা পুরনো তবে চন্দ্র-সূর্যের মতো এক্কেবারে

আদ্দিকালের নয়।

এইতো গেল বছরের ঘটনা। সেদিন, ১৪ আগস্ট। শ্রাবণের 'লাস্ট স্টেশন' ছুঁইছুঁই। আকাশ ভরা থৈ থৈ মেঘ। 'আয় বৃষ্টি ঝেপে' কবিতা যেন হামলে পড়লো রোকেয়া মহলের চাঁদের আঙ্গিনায়। বহু কষ্টে দ্বাদশী চাঁদ তার ঝলমলে হাসি চেপে রেখেছে সন্ধ্যের অপেক্ষায়। কোথা থেকে উড়ে এলো এক দল উচ্ছল খেলোয়াড়, যেন রেফারির বাঁশির অপেক্ষায় তারা ছিল। শুরু হলো জম্পেশ আয়োজন। যার পোশাকি নাম 'ঈদ-পুনর্মিলনী'। খোলাসা করে বললে বলতে হয় টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী করটিয়ার লাইটহাউজ স্কুলের সাবেক ছাত্র-ছাত্রীদের ঈদ-পুনর্মিলনী।

সারা বাংলাদেশে এমনকি আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি ও মালয়েশিয়াসহ পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে আছে এর কৃতী শিক্ষার্থীরা। সেদিনও কানাডা থেকে ভিডিও কনফারেন্সে সবার সাথে মিলিত হয়েছে প্রতিভাবান শিক্ষক মনিরুল হান্নান, জাপান থেকে সাদিয়াটেকের নবীন এমডি সাদিয়া হক। আর আমিও খোঁড়াতে খোঁড়াতে চেষ্টা করেছি তাল মেলাতে। সেদিনের শিক্ষার্থী বন্ধুদের সাথে আমার এলোমেলো কথাগুলো সবার সাথে শেয়ার করলে কেমন হয়? (কী সেই কথা?)

আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন

'বাবা, আমি পিটার বলছি। আমরা এই মাত্র শৃঙ্গে এসে পৌঁছেছি।' ছোট একটি উক্তি; কিন্তু এর মাধ্যমেই অর্ধশতাব্দীর দুই প্রান্তে এক সেতুবন্ধ রচিত হলো।

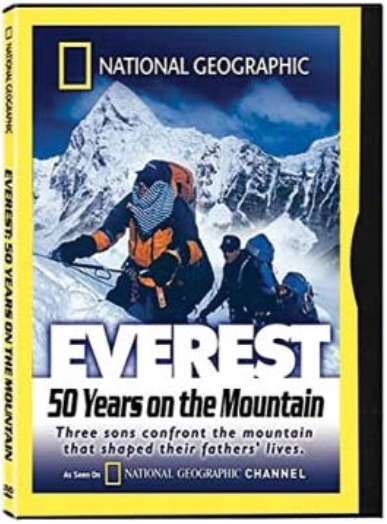

পিটার হিলারি যখন এভারেস্টের ২৯০২৯ ফুট উঁচু শৃঙ্গে এসে পৌঁছলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে তার বাবা স্যার এডমান্ড হিলারির কাছে এই ছোট বার্তাটি পাঠালেন।

পিটার হিলারি যে এই প্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গে উঠলেন, তা নয়। তিনি প্রথমবার মাত্র ১০ বছর বয়সে বাবার সঙ্গে ৮,০০০ ফুট একটি শৃঙ্গে উঠেছিলেন। এবারের আরোহণের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। এবারের পর্বতারোহণের মাধ্যমে ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফি চ্যানেলের এডমান্ড হিলারি ও তেনজিং নোরগের পর্বতারোহণের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান পালন করল। উল্লেখ্য, ২৯ মে ১৯৫৩ সালে তার বাবা এডমান্ড এবং তার সঙ্গী তেনজিং হিমালয়কে পদানত করেছিলেন।

কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, হিলারি-নোরগের পর্বতারোহণের পর অর্ধ-শতাব্দী কেটে গেছে, পৃথিবী অনেক আধুনিক

হয়েছে। যন্ত্রপাতিও আধুনিক হয়েছে, সুতরাং এভারেস্টে ওঠা ঠিক আগের মতো কঠিন নয়; আসলে ঘটনা অতো সহজও নয়। এ যাবৎ মাত্র ৪০০ জন সফলভাবে এই শৃঙ্গে পৌঁছতে পেরেছেন। পাশাপাশি মৃত্যুবরণ করেছেন প্রায় ২৬০ পর্বতারোহী। যাদের অনেকের লাশই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

হিলারি, তেনজিং থেকে শুরু করে পিটার পর্যন্ত যারাই সফল হয়েছেন, তারা হাজার হাজার প্রচেষ্টাকারীর মত ব্যর্থ হননি। এমনকি মৃত্যুবরণকারী অভিযাত্রীর মতো চিরতরে হারিয়ে যাননি। এর অন্যতম প্রধান কারণ, তারা আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তাদের সকল মনোযোগকে বিজয়ের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। আর যারাই তাদের সকল মন, মেধা ও শক্তিকে বর্তমানের জন্য নিয়োজিত করতে পারে, সফলতা তাদের পদচুম্বন করবেই করবে।

এক্ষণে, মনে পড়ে গেল রিচ ড্যাড এবং পুওর ড্যাড (*Rich Dad Poor Dad*) এর বিখ্যাত লেখক রবার্ট কিয়োসাকি (Robert Kiyosaki) এর কথা। তিনি একজন জাপানিজ অরিজিন আমেরিকান। একজন বিজনেস মোটিভেটর স্পিকার ও লেখক। তার মোট ২৬টি বইয়ের ভেতর এই একটি বই ৫১টি ভাষায় ১০৯টি দেশে প্রায় সাড়ে ৩

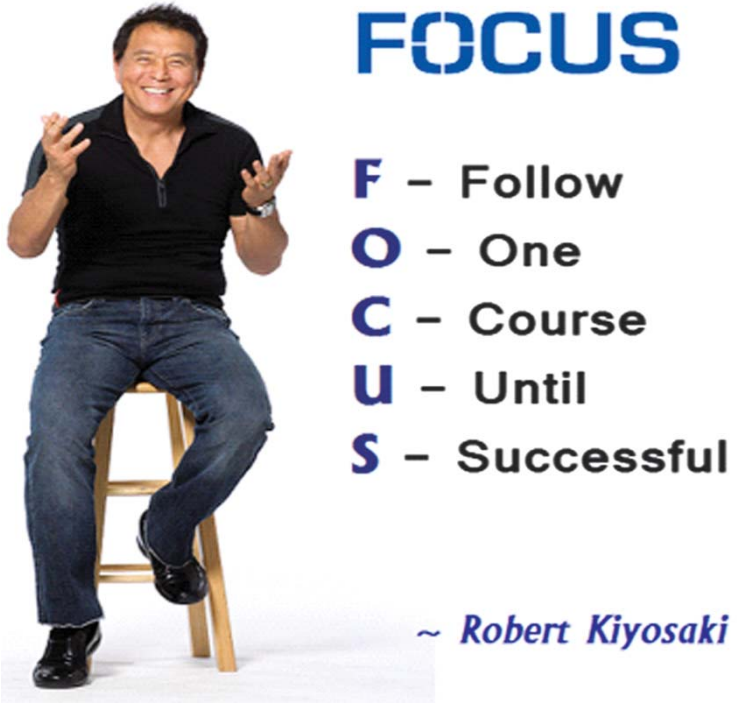

কোটি কপি বিক্রি হয়েছে। ভাবা যায়? যারা ভবিষ্যতে সফল ব্যবসায়ী হতে চায় তাদের জন্য এই বইটি অবশ্যপাঠ্য।

তার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটি হয়তো তিনি এভারেস্ট বিজয়ীদের সাফল্যগাথা থেকে ধার করেছিলেন। পড়ালেখা, ভালো রেজাল্ট, আত্মোন্নয়ন এমনকি সকল উন্নয়নের জন্যই সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সোনার হরফে বাঁধাই করার মতো সে লেখাটি হচ্ছে,

একটি বিষয় নিয়েই লেগে থাকা ভালো
যতক্ষণ না পাবো সাফল্যের পূর্ণ-আলো॥

পর্বতকে নয় বরং নিজেকেই জয় করেছি

২০ জুলাই ১৯৬৯। আজ থেকে ৫১ বছর আগে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে সর্বপ্রথম চাঁদের বুকে পা রেখেছিলেন নিল আর্মস্ট্রং। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন, "এটি চাঁদের বুকে ছোট্ট মানবের একটি ক্ষুদ্রতম পদক্ষেপ; মানবতার জন্য বৃহত্তম এক পদক্ষেপ।" আর্মস্ট্রং ছয় বছর বয়সে বাবাসহ প্রথম বিমানে চড়েন। যুবক জীবনে ছিলেন মিলিটারি পাইলট। নাসা থেকে অবসর নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্লাইট মেকানিকস ও এয়ারক্রাফট ডিজাইনের ওপর শিক্ষকতার দায়িত্ব নেন। এমনকি বাচ্চাদের জন্য কবিতাও লেখেন। তিনি ১৬ বছর আগে হিলারির 'এভারেস্ট বিজয়' দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন, হাজারো মানুষ তেমনি আর্মস্ট্রং দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন এবং হবেন।

২০ জুলাই ১৯১৯। চাঁদে মানুষের পদক্ষেপ ফেলার ঠিক গুনে গুনে ৫০ বছর আগের কথা, পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলেন এডমান্ড হিলারি, যিনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টে প্রথম মানুষ হিসেবে পা রাখেন। সেদিন ছিল ১৯ মে, ১৯৫৩। সেই দম আটকানো মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন, "আমরা পর্বতকে জয় করিনি বরং নিজেকেই জয় করেছি।"

নেপালিরা তাকে ডাকে সাগরমাতা (Sagarmatha) অর্থাৎ আকাশের কপাল। আর তিব্বতে স্থানীয়ভাবে এর নাম চোমোলাংমা (Chomolangma) অর্থাৎ বিশ্বমাতা। উচ্চতা ৮,৮৪৮ মিটার বা ২৯০২৯ ফিট। এর জাস্ট চাদির ওপর দিয়ে জেটবিমান উড়ে। বয়স মাত্র ৬ কোটি বছর। বলতে পারো কে এই মহামান্য? এখন তার বিশ্বখ্যাতি 'মাউন্ট এভারেস্ট' হিসেবে।

জর্জ এভারেস্ট ছিলেন সার্ভেয়ার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। ১৬ বছর বয়সে ভারতে এসে ১৮৩০ থেকে '৪৩ পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি দক্ষিণ ভারত থেকে নেপাল পর্যন্ত

২,৪০০ কিলোমিটার সার্ভে করেন।

জর্জ এভারেস্টের উত্তরসূরিরা তার নামে পর্বতটির নামকরণ করেন। যদিও এতে তার আপত্তি ছিল, কেননা মহা আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিনি নিজ চোখে এভারেস্টকে কখনও দেখেননি। আসলে এটি ছিল উপনিবেশবাদীদের কূটবুদ্ধি। আসুমুদ্র-হিমাচলে তাদের খ্যাতি ছড়িয়ে দেওয়া।

ব্রিটিশ সরকার প্রেরিত সাবেক আর্মি অফিসার যোহান হান্টের নেতৃত্বে শুরু হয় এডমান্ড হিলারিদের এভারেস্ট অভিযান। মোট অভিযাত্রী ছিল প্রায় ৪০০ জন। কিন্তু তারা দুই টিমে মোট চারজন সর্বোচ্চ শৃঙ্গের কাছাকাছি যেতে পারেন। আরেকটি টিম প্রথম চেষ্টা করে ৩০০ ফিট বাকি থাকতে আর উঠতে পারেনি। এরপর হিলারিদের পালা। তারা ৪০ ফিট উঁচু একটি শিলা; বর্তমানে যার নাম হিলারি স্টেপ, তার সামনে এসে থমকে দাঁড়ান। অতঃপর অনেকটা হামাগুড়ি ও চিতার মতো ছোট্ট লাফ দিয়ে সকাল ১১.৩০ মিনিটে এভারেস্টের শীর্ষে গিয়ে পৌঁছান। সেখানে তারা মাত্র ১৫ মিনিটকাল অতিবাহিত করেন। হিলারি বরফ কুঠার হাতে তেনজিংয়ের ছবি তুলেন। কিন্তু তেনজিং ছবি তুলতে পারতেন না বলে হিলারির কোন ছবিও নেই। তোমরা হয়তো আফসোস করে বলবে হায়! সে সময় যদি অটো ক্যামেরা কিংবা সেলফি চালু থাকত! কিন্তু না আজকের সেলফিবাজ কিংবা অতিমাত্রায় ফটোপ্রেমিকদের বলছি, এতে করে কিন্তু হিলারি পিছিয়ে যাননি। নিউজিল্যান্ড জাতীয়ভাবে তাদের পাঁচ টাকার কারেন্সিতে তার ছবি ছাপিয়ে দিয়েছে। তুমি আমি প্রতিদিন নিজের হাজারো ছবি তুললেও জাতীয় কারেন্সিতে ঠাঁই পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? তাই ছবির চাইতেও লক্ষ গুণ বড় হচ্ছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যেগুলো মানবতাকে এগিয়ে দেয়।

এডমান্ড হিলারি মাঝারি মানের ছাত্র ছিলেন। মায়ের ইচ্ছায় ভালো স্কুলে

পড়তে গিয়ে টানা সাড়ে তিন বছর প্রতিদিন প্রায় ১০০ মিনিট ট্রেন জার্নি করতে হতো। এ সময়টা তার পড়ায় কাটতো। কিছুটা লাজুক প্রকৃতির। দুষ্টো বন্ধুদের খোঁচা থেকে বাঁচতে নিজেকে সর্বদা বইয়ের সাগরে ডুবিয়ে রাখতেন তিনি। বই আর বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন, এই দুটিই ছিল তার একমাত্র পুঁজি। মাধ্যমিকে পড়া অবস্থাতেই তিনি শুধু স্বপ্ন দেখতেন বিশ্বভ্রমণ ও পর্বতারোহণের। স্কুলজীবনে বক্সিং লড়তেন। ১৬তে পা দিয়েই প্রথম চেষ্টায় বন্ধুদের সাথে মাউন্ট রোয়াপিহুর চূড়ায় ওঠেন। অতঃপর ২০ বছর বয়সেই তিনি মাউন্ট অলিভারের শীর্ষে ওঠেন।

হিলারির পিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একজন আর্মি অফিসার ছিলেন। তিনি যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময় একজন সাংবাদিক ও পরবর্তীতে একটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। হিলারিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে এয়ারফোর্সে যোগ দেন। তারা ছিলেন দুই ভাই ও এক বোন। সে সময় পিতার সঙ্গে তারা দুই ভাই মৌমাছি চাষ করতেন। প্রতিদিন প্রায় ১৬০০ মৌচাকের কাছে যেতে হতো। প্রায় হাজার খানেক ৯০ পাউন্ড ওজনের মৌমাছি-বাক্স ওঠা নামা করাতে হতো। এতে করে প্রতিদিন কমছে কম ১০০ মৌমাছির বিষাক্ত হুল ভাগ্যে জুটতো। এভাবে তিনি নিজেকে পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও কষ্টসহিষ্ণু হিসেবে গড়ে তুলেন। তখন তিনি বুঝতে পারেন শারীরিক শক্তি ও কষ্টসহিষ্ণুতায় বন্ধুদের ভেতর তিনিই সেরা। তিনি নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারই তাকে ব্যাপকভাবে পাল্টে দিল। এরপর শুধু তার সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পালা। বিজয়, পদক আর খ্যাতি অর্জনের পালা ।

তাই যে কোনো ক্ষেত্রে নিজের **'সাফল্যের পূর্বশর্ত হচ্ছে নিজকে পূর্ণভাবে আবিষ্কার'**। নিজের সেরা দিকগুলো খুঁজে পাওয়া। তারপর প্রভুর ওপর ভরসা করে সেই ক্ষেত্রে সাহসী রয়েল বেঙ্গলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়া ।

হিলারি ৬ ফিট ৫ ইঞ্চি লম্বা ছিলেন, কিন্তু এজন্য তার খ্যাতি হয়নি। শিক্ষকতা না করেও তিনি স্যার হয়েছিলেন রানী এলিজাবেথ দ্বিতীয় থেকে নাইট উপাধি পেয়ে। নিউজিল্যান্ড তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেয়, তাদের পাঁচ টাকার কারেন্সিতে তার ছবি ছাপায়। নেপাল তাকে সর্বপ্রথম বিদেশী হিসেবে নাগরিকত্ব দেয়।

হিলারি হিমালয় এলাকাটিকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। ১৯৮৫-৮৮ সালে একাধারে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তার সব দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি প্রায় ১১টি বই লেখেন।

তিনি পৃথিবীর প্রথম মানুষ, যিনি সবচেয়ে দুর্গম তিনটি এলাকা জয় করেছেন; মাউন্ট এভারেস্ট, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। তার ছেলে পিটারও বাবার মতোই এ তিনটি জায়গা জয় করেছেন। এক্কেবারে বাপকা বেটা।

আসলে, একটি গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যকে শক্ত-সিঁড়ি বানাতে পারলে তার ওপর ভর করে নিজেকে এমনকি পরবর্তী প্রজন্মকেও সাফল্যের সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া যায়।

বলতে পারো

জুন ২০২০ সংখ্যার সমাধান

১. প্রায় ১৫০টি বিষয়ে ৩০০টি আয়াতে। ২. পেরুতে এবং পেরুর ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানী আন্দ্রে রুসো। ৩. সিরাজগঞ্জ জেলার, চর বেলতৈল। ৪. আব্রাহাম লিংকন। ৫. ১৮৫৭ সালে। ৬. ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন এবং মীর জাফর প্রধান সেনাপতি। ৭. ৩৭ ট্রিলিয়ন। ৮. ৮টি। ৯. ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে অলিয়ে কামিল সৈয়দ শাহ আহমদ (র)। ১০. ৫,৭৭,২৮,৫৬৩ হেক্টর এবং ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর।

সেপ্টেম্বর ২০২০ সংখ্যার প্রশ্ন

১. শরতের অন্যতম বড় আকর্ষণ কোন ফুল?

২. সোয়ালোয়ারের মৃতদেহ সমুদ্রপৃষ্ঠে ভেসে ওঠে কত সালে?

৩. আমি চাঁদের পৃষ্ঠে পা রেখে এরকমই কিছু মধুর ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলাম। তখন তাঁর মিসরীয় বন্ধু এটিকে তাঁর কাছে আজানের ধ্বনি নিশ্চিত করলে তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি কে?

৪. কানাডার আয়তন কত এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে?

৫. "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও সঠিক সত্য কথা বলো।" কোন সূরার কত নম্বর আয়াত?

৬. লিভারপুলের শিরোপা জয়ের অন্যতম নায়ক ক্লাবটির কোন খেলোয়াড়?

৭. ডিসকর্ড যাত্রা শুরু করে কত সালে এবং বর্তমান ব্যবহারকারীর পরিমাণ কত?

৮. "তোমরা সত্যবাদী হও। কেননা সত্য পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের পথে নিয়ে যায়।" বক্তব্যটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

৯. জাপানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯২৮ সালে কোন বাগানটি 'প্রাকৃতিক গুপ্তধন' হিসেবে তৈরি করে?

১০. মৃত্যুর ফেরেশতাকে চোখে চপেটাঘাত করলেন কোন নবী?

(সবগুলো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে কিশোরকণ্ঠ আগস্ট ২০২০ সংখ্যায়।)

শ্রাবণী

ছন্দা দাশ

রোজ ভোরে দেখি মেয়ে
হাত দুটি বাড়িয়ে
বৃষ্টির গান গায়
জানালায় দাঁড়িয়ে ।

শ্রাবণের মেঘে তার
কি যে হয় কে জানে
ভাবনার স্বরলিপি
তোলে সুর সে গানে ।

শ্রাবণের ধারাপাতে
সে গানের সৃষ্টি
বাকি সব থেমে যায়
মেয়ে আর বৃষ্টি ।

কোন নামে ডেকে বলি
কোন কথা কি জানি
মন বলে ডাকি তারে
ওগো মেয়ে শ্রাবণী ।

সম্পদই সর্বনাশ করলো সা'লাবাকে

এস. এম রুহুল আমীন

সম্পদ! অর্থকড়ি টাকা-পয়সারই অপর নাম। মানুষের সুন্দর স্বাস্থ্যও সম্পদ। সম্পদ বাড়ি গাড়ি পুত্র পরিজনও। এর পিছনেই মানুষ দৌড়ায় আর দৌড়ায়। ছুটে চলে অশ্ববেগে। পাওয়ার লোভে এগিয়ে যায়। কাউকে পেছনে ফেলে ল্যাং মেরে। আবার কারো সাথে প্রতারণা করে। আবার কেহ ইহা অর্জন করে কঠোর পরিশ্রম করে।

এটা পাওয়ার চেষ্টা সবাই করে। করে আমরণ। জীবনের শুরু থেকে মৃত্যু অবধি। মহান আল্লাহ সূরা আত-তাকাসুরে এ কথা বলেছেন। কবরে পৌঁছা পর্যন্ত এ চেষ্টা অব্যাহত থাকে। প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন– বনি আদম

কবরের মাটি খেলেও তার ক্ষুধা মিটবে না। পাওয়ার ক্ষুধা মিটবার নয় কখনো।

ধনী গরিব নির্বিশেষে সবারই চাওয়া আর পাওয়ার বিষয় সম্পদ। চাই আরও চাই। সম্পদ চাই আর সম্পদ চাই। কেহ কেহ সম্পদকে বলেছেন সকল সুখের মূল। আবার কেহ বলেছেন অর্থই অনর্থের মূল। সবই সঠিক। যদি ভারসাম্য রক্ষা না হয়। ঠিক পানি যেমন জীবন। তেমন মরণও বটে।

নাম সালাবা। তাগড়া যুবক। মদিনার অধিবাসী। আল্লাহ্‌র নবীর একজন সাহাবী। হঠাৎ সম্পদের লোভ জেগে উঠলো তার। মালিক হবে। হবে প্রচুর সম্পদের মালিক। আল্লাহ্‌র নবীকে অভিপ্রায় জানালো সা'লাবা। হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার জন্য দু'আ করুন। আল্লাহ যেন আমার সম্পদ বাড়িয়ে দেন। মহানবী (সা.) বললেন। এটা তোমার উচিত হয়নি। ভেবে দেখো সা'লাবা।

অন্য আরেক দিন। রাসূল (সা.)কে আরজ করলেন সা'লাবা। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ভেবে দেখেছি। আমার জন্য আপনি দু'আ করুন। আল্লাহ যেন আমার সম্পদ বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) বললেন। হে সা'লাবা! তুমি কি আমার পথ থেকে সরে গিয়েছো? আমার পথ তো এটা নয়। তোমার ভেবে দেখা উচিত। তুমি নিশ্চয়ই জানো। আমি ইচ্ছা করলে ওহুদ পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে সাথে রাখতে পারি। কিন্তু এটা আমি করছি না। তুমি আরো ভেবে দেখো। হে সা'লাবা!

অন্য আরেক দিনের কথা। নাছোড়বান্দা। তৃতীয় বারের মতো সবিনয় অনুরোধ জানালো সা'লাবা। হে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবিব! আপনি দু'আ করুন আল্লাহ্‌র কাছে। আমি যেন সম্পদশালী হই। আমি ওয়াদা করছি। আমার সম্পদ ব্যয় করবো আল্লাহ্‌র পথে। গরিব দুঃখী আর অসহায় মানুষদের জন্য। মহান আল্লাহ্‌ ও তাঁর প্রিয় হাবিবের ইচ্ছা অনুযায়ী। আমার সম্পদ হবে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম বাহন।

মহানবী (সা.) সা'লাবার ওয়াদার সম্মান জানালেন। আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন। ইয়া আল্লাহ্‌! আপনি সা'লাবার জন্য ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করুন। আল্লাহ দু'আ কবুল করলেন। সা'লাবার সম্পদ বাড়তে লাগলো। বাড়তে লাগলো জ্যামিতিক হারে। আশ্চর্যজনকভাবে। বেশুমার সম্পদের মালিক হলেন সা'লাবা। উট ছাগল আর ভেড়া হলো অসংখ্য ও অগণিত।

সা'লাবা বাস করতেন মদিনায় মসজিদে নববীর খুবই কাছে। নামায পড়তেন পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতের সাথে। সংস্পর্শ পেতেন আল্লাহ্‌র নবীর। দেখা হতো অনেক মুসলিমের সাথে। হতো কুশল বিনিময়। খোঁজ খবর নিতেন একে অপরের। রচিত হতো ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আর সাম্যের সুদৃঢ় মিনার।

বিপত্তি ঘটতে থাকলো সা'লাবার। সম্পদ বেড়ে যাচ্ছে তার। নিয়মিত আসতে পারেন না মসজিদে। আসেন মাঝে মধ্যে। পশুর খামার সরিয়ে নিলেন মসজিদ থেকে খানিক দূরে। এখন আসেন শুধু শুক্রবারে জুম'য়া পড়তে। পশুর খামার বাড়তেই লাগলো তার। সঙ্কুলান হয় না জায়গায়। চলে গেলেন মদিনার শেষ প্রান্তে। বলতে গেলে উপকণ্ঠে। পর্যায়ক্রমে চলে গেলেন

মদিনার বাইরে। এখন সা'লাবা আসতে পারেন না জুম'য়ার নামাযেও।

কী করবেন সা'লাবা। সম্পদই যেন তার কাল হতে লাগলো। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) খোঁজ খবর নেন সা'লাবার। আর দুঃখ করেন। কী ই বা করবেন তিনি। তার পরও খোঁজ নেন। আল্লাহ্‌র পথে ইস্তেকামাত থাকার জন্য। একদিন সাহাবারা জানালেন সা'লাবার অবস্থা। নামাযেও অনুপস্থিত থাকে। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) শুধু বললেন। সা'লাবার জন্য আফসোস! সা'লাবার জন্য আফসোস! সা'লাবার জন্য আফসোস! এ কথাটি আল্লাহ্‌র নবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তিনবার বললেন।

ওহি এলো আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। হযরত মুহাম্মদ (সা) এর কাছে। যাকাত দিতে হবে সম্পদের। আল্লাহ্‌র নবী দু'জন সাহাবাকে পাঠালেন বনি বুহায়লা ও বনি সুলাইম গোত্রের কাছে। সা'লাবা ও বনি সুলাইম গোত্রের আরো এক ব্যক্তির কাছে যাকাত আদায়ের জন্য। যাকাত আদায়কারী দু'জন প্রথমে গেলেন সা'লাবার কাছে। সা'লাবা সব শুনে বললো। এটা আবার কেমন কথা? যাকাত আবার কী? এটা কেমন যেনো হয়ে গেলো না? আচ্ছা তোমরা সুলাইম গোত্রের ব্যক্তির কাছ থেকে এসো। আমি ভেবে দেখবো বিষয়টি।

যাকাত আদায়কারী দু'জন চলে গেলেন বনি সুলাইম গোত্রের ব্যক্তির কাছে। তিনি সব শুনলেন এবং বললেন। আল্লাহ্‌র নবী পাঠিয়েছেন। এই সুন্দর সুন্দর পশুগুলো নিয়ে যাও। এটাই আমার পক্ষ থেকে যাকাত। তার পর যাকাত আদায়কারী দু'ব্যক্তি আসলেন সা'লাবার কাছে। সা'লাবা ভুলে গেল অতীত। ভুলে গেলো ওয়াদার কথা। দু'জনকে দেখেই ভ্রু কুঁচকালো। চেহারা কালো করে ফেললো। মনের ঝাল মিটিয়ে বলতে লাগলো। এটা কিসের যাকাত? এতো জিজিয়া হয়ে গেলো না? যা আদায় করা হয় ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের কাছ থেকে। আমি যাকাত দেব না। আমি দেখা করবো আল্লাহ্‌র নবীর সাথে।

বিষণ্ন বদন! যাকাত আদায়কারী দু'জন চলে গেলেন। আল্লাহ্‌র নবীর দরবারে। সব খুলে বললেন তারা। বললেন সা'লাবার ঘটনাও। কষ্ট পেলেন আল্লাহ্‌র নবী। শুধু বললেন। সম্পদই সর্বনাশ করলো সা'লাবাকে। আফসোস! সা'লাবার জন্য। সে তার কথা রাখলো না। সা'লাবা ভুলে গেলো তার ওয়াদা? তাহলে ঠিক আছে। তার থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) তার যাকাত গ্রহণ করেননি কোন দিন। করেননি কোন দিন হযরত আবু বকর (রা.)। হযরত আবু বকরের (রা.) কাছে পেশ করা হলে তিনি বললেন– যা আল্লাহ্‌র রাসূল গ্রহণ করেননি তা আমিও করতে পারি না।

এভাবে মানুষ সম্পদের মোহে ভুলে যায় আল্লাহকে। অস্বীকার করে তার অতীতে করা ওয়াদাকে। যেভাবে করেছেন আল্লাহ্‌র নবীর সাহাবী সা'লাবা। পরিশেষে যা হবার তাই হলো। সা'লাবার লোভ ও সম্পদই ধ্বংস করলো তাকে। ক্ষতিগ্রস্ত হলো দুনিয়া ও আখিরাতে।

(সূরা আত-তাওবাহ অবলম্বনে)

সাদা মেঘের ভেলা

মোরশেদা হক পাপিয়া

ও সাদা মেঘ বলো
আবার বুঝি মন হলো ভার?
সারা আকাশ কালো!
ঝরঝরিয়ে দুনিয়া ভেজাও
যখন তখন
তোমার ছেলে দস্যি বুঝি
আমার মতন?

মা তো আমার দু'হাত তুলে
জায়নামাজে
রবের আরশ কাঁপিয়ে কাঁদেন
সকালে সাঁঝে ।
আমি যেন জান্নাতি হই
সঠিক পথে সর্বদা রই
সকল প্রাণে প্রদীপ জ্বেলে
আলোকিত মানুষ হই ।

তোমার ছেলে সঙ্গী হবে
সেদিন আমার,
আর কেঁদো না
আর ভেবো না
এবার ভাসাই নীল আকাশে
ভেলা তোমার ।

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ড্রোন

আল জাবির

যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যত বেশি ভালো সেই দেশের সেনাবাহিনী প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে তত বেশি উন্নত। একবিংশ শতাব্দীতে মিলিটারি প্রযুক্তিতে এমনই এক অন্যতম হাতিয়ার ড্রোন। ড্রোন হলো এমন একটি চালকবিহীন আকাশযান যা কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ড্রোনটির মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর গতিবিধির লাইভ স্ট্যাটাসের পাশাপাশি HD ছবি-ভিডিও দেখা যাবে। অভিনব এই ড্রোনের নাম 'দ্য ব্ল্যাক হরনেট পার্সোনাল রিকনিসেন্স সিস্টেম।

বিগত বছরগুলোতে পুরো পৃথিবীতে বেড়েছে সামরিক ব্যয়। যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রস্তুতি, অস্ত্রাগার বাড়িয়ে তোলা আর বিধ্বংসী প্রযুক্তির উদ্ভাবনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কারণে অনেক দেশই সামরিক খাতে খরচ বাড়িয়েছে। সেই সামরিক ভাণ্ডারে এবার নতুন প্রযুক্তির ড্রোন যোগ করেছে আমেরিকা।

মার্কিন সৈন্যদের জন্য তৈরি নতুন এই ড্রোন কোনও ব্যক্তির পকেটে সহজেই ঢুকে যাবে। এমনকি হাতের তালুতেও লুকিয়ে রাখা যাবে ড্রোনটি। যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে প্রায় ১.২ মাইল বা ২ কিলোমিটার পর্যন্ত নজর রাখতে সক্ষম এই ড্রোন।

ব্ল্যাক হর্নেট ন্যানো ড্রোনটি দেখতে একদম খেলনা হেলিকপ্টারের মতো। লেটেস্ট মডেলের ৬.৬ ইঞ্চি লম্বা এই ড্রোনটির ওজন মাত্র ৩৩ গ্রাম। ব্যাটারিতে ফুল চার্জ থাকাবস্থায় ঘণ্টায় সর্বোচ ২১ কিলোমিটার বেগে টানা ২৫ মিনিট উড়তে

পারে ড্রোনটি। ওড়ার সময় শব্দ এতটাই কম হয় যে, সর্বোচ্চ ১০০ মিটার উচ্চতায় ওড়ার সময় ড্রোনটি দেখে অনেকেই একটি ছোট পাখি ভেবে ভুল করতে পারেন।

একটি ব্ল্যাক হর্নেট সর্বনিম্ন -১০ ডিগ্রি থেকে সর্বোচ্চ +৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়, জিপিএস কাজ করে না এমন জায়গাতেও উড়তে পারে অনায়াসে। ফলে এর মাধ্যমে কোনো দুর্গম গুহায় ওঁৎ পেতে থাকা শত্রুপক্ষ বা আটকে পড়া শ্রমিক কিংবা অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব।

এতে রয়েছে ৩টি বিশেষ ধরনের উন্নতমানের ক্যামেরা যেগুলো দিনে এবং রাতে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে সক্ষম। এর একটি বিশেষ সুবিধা হলো, যদি শত্রুপক্ষের কাছে কোনোভাবে ধরা পড়ে যায়, তবে শত্রুপক্ষের বোঝা সম্ভব নয় এর মাধ্যমে তাদের কোন কোন তথ্যগুলো ফাঁস হয়েছে। কারণ ব্ল্যাক হর্নেটকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে, এটি কেবল কন্ট্রোলার ডিভাইসেই লাইভ ভিডিও ও স্থিরচিত্র প্রেরণ করে থাকে, ড্রোনটির আলাদা কোনো স্টোর নেই যেখানে ভিডিও সংরক্ষিত থাকবে।

ব্ল্যাক হর্নেটের কন্ট্রোল অপারেটর ডিভাইস থেকে একাধিক ড্রোন একইসাথে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আবার চাইলে দুজন অপারেটর একইসাথে একটি ড্রোন থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এটি যেমন কন্ট্রোলার ডিভাইস দিয়ে কোনো ব্যবহারকারী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তেমনই কন্ট্রোলার ডিভাইসে ম্যাপ যুক্ত করে দিলে সেই ম্যাপ অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবেও উড়তে পারে।

প্রতি সেকেন্ডে ২০ পা-এর দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে সামরিক ড্রোন। শত্রুর এলাকায় পৌঁছে নীরবেই ভিডিও ও ছবির মাধ্যমে তথ্য জোগাড় করায় সক্ষম

ব্ল্যাক হর্নেট ন্যানো ড্রোনটি দেখতে একদম খেলনা হেলিকপ্টারের মতো

বিশ্বের প্রায় ২০টি দেশের সেনাবাহিনী ব্ল্যাক হর্নেট ন্যানো ড্রোন ব্যবহার করছে

এটি।

FLIR সংস্থার মতে, এই ড্রোন ব্যবহার করে যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে শত্রুর চেয়ে অনেক ধাপ এগিয়ে থাকার পাশাপাশি শত্রুর ফাঁদ থেকে আগাম সতর্ক হওয়া সম্ভব।

বিশেষ প্রযুক্তির উন্নত ড্রোনগুলো সহজেই রাডার উপেক্ষা করে শত্রুঘাঁটিতে হামলা করে মুহূর্তেই যুদ্ধের মোড় বদলে দিতে পারে। তবে ড্রোনের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। এটি যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণের কাজে ব্যবহৃত হয়, তেমনই এর মাধ্যমে শত্রুপক্ষের ওপর গোপন নজরদারিও করা যায়।

এ ছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবর নেওয়া, দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় সাহায্য পৌঁছানো, সিনেমার দৃশ্য ধারণ, ফটোগ্রাফি ইত্যাদির কাজেও আজকাল ড্রোনের ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

ব্ল্যাক হর্নেট ন্যানোতে বিভিন্ন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে ড্রোনটির ব্যবহারকারী চমৎকার কিছু সুবিধা পেয়ে থাকেন। যেমন : কোনো কারণে যদি কন্ট্রোলার ডিভাইসের সাথে ড্রোনটির যোগাযোগে ব্যাঘাত ঘটে, তবে এটি যেখান থেকে ওড়ানো হয়েছিল ঠিক সেই জায়গাতে চলে আসবে। তা ছাড়া এটি ওড়ানোও বেশ সহজ, মাত্র ৩০-১২০ সেকেন্ড সময় নেয় যেকোনো মিশনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হতে।

অন্যান্য ড্রোনের চেয়ে খরচ তুলনামূলক কম হওয়াতে আন্তর্জাতিকভাবে ব্ল্যাক হর্নেট ন্যানোর বেশ চাহিদা তৈরি হয়েছে। হওয়াটাও স্বাভাবিক, কারণ দুর্গম অঞ্চল বা দুর্ধর্ষ শত্রু অবস্থানের ওপর গোপন নজরদারিতে এটি অতুলনীয়।

বর্তমানে আমেরিকার স্পেশাল ফোর্স, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, স্পেন, নরওয়ে ও ভারতসহ বিশ্বের প্রায় ২০টি দেশের সেনাবাহিনী ব্ল্যাক হর্নেট ন্যানো ড্রোনটি ব্যবহার করছে।

ধারাবাহিক গোয়েন্দা উপন্যাস

গন্ধ-পাগল

জুবায়ের হুসাইন

ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে 'থ' মেরে গেল কিশোর গোয়েন্দা বিপ্লব খান।

গোয়েন্দাগিরিতে ইতোমধ্যেই বেশ সুনাম কুড়িয়ে নিয়েছে বিপ্লব। পুরো নাম বিপ্লব খান হলেও সর্বমহলে বিপু ভাইয়া নামে পরিচিত। কয়েকটা বেশ জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ রহস্যের সমাধান করে খোদ পুলিশের ইনভেস্টিগেশন টিমকে নাড়িয়ে দিয়েছে। বাঘা বাঘা গোয়েন্দারা যে কেসের সমাধানে হিমশিম খেয়েছে,

তেমনই কিছু কেসের তদন্ত করে সুন্দর সমাধান বের করায় গোয়েন্দামহলে ও এক নামেই পরিচিত। অবশ্য ওকে দেখলে সে রকমটি মনে হয় না। হালকা-পাতলা চেহারার এক কিশোর ও। মাথাভর্তি একরাশ ঘন কালো চুল। মুখের থুতনিটা একটু ঝোলানো। সে কারণে মুখের শেপটা একটু লম্বাটে ধরনের। তবে একটু তীক্ষ্ণ করে তাকালে ওর চোখে-মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একটা কাজ সেরে হেঁটেই বাড়ি ফিরছিল ওরা, বিপ্লব ও আবিদ। বিপ্লবের এবারের সফরসঙ্গী আবিদ। একই এলাকায় বাড়ি ওদের। পড়ে একই স্কুলে, একই ক্লাসে।

মাথার চুল ফুর ফুর করে উড়ছিল বাতাসে বিপ্লবের। চুল ও বরাবরই একটু বড়ই রাখে। চোখে-মুখে বেশ আরাম বুলিয়ে দিচ্ছিল বাতাসটা। এমনিতেই ঘামে ভিজে শার্টের নিচে গেঞ্জি শরীরের সাথে লেপটে গেছে।

আবিদের তো গেঞ্জি ভিজে শার্টও কালার পরিবর্তন করে ফেলেছে। নীল রঙের শার্টটা ঘামে ভিজে গাঢ় নীল রঙ ধারণ করেছে।

ভেজা শরীরে শেষ দুপুরের সুন্দর হাওয়াটা যেন সমস্ত দেহমনে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিল। শুকনো গলাটা যেন প্রাণ ফিরে পেল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে এসে ধুকপুক করছে। এক্ষণে সেটাও শান্ত হলো যেন।

'আহ্!' অস্ফুটে আবিদের কণ্ঠ থেকে শব্দটা বেরিয়ে এলো। দু'হাত দু'পাশে মেলে অ্যারোপ্লেনের মতো কিছুটা ছুটল। অবশ্য রাস্তাটা একটু নিরিবিলি হলেও টুকটাক বাইসাইকেল ও রিকশা যাওয়া-আসা করছে টুংটাং বেল বাজিয়ে। তেমনই একটা সাইকেল সাঁই করে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আরেকটু হলে আবিদকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেই দিয়েছিল আর কি। সাইকেলটাকে সাইড দিতে গিয়ে একটু ঘুরে গিয়েছিল ওর শরীরটা। আর তখুনি বেটারিচালিত রিকশাটা ওর পাশে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে ওকে তুলে নিয়েই প্রায় বাতাসের বেগে চলে গেল।

বিপ্লবের ব্যাপারটা বুঝতেই অনেকটা সময় লেগে গেল। ততক্ষণে রিকশাটা সামনের মোড় ঘুরে উঁচু পাঁচিলের ওপাশে হাওয়া হয়ে গেছে। ও কেবল মুখ ফুটে বলতে যাচ্ছিল, 'আল্লাহপাক কতই না দয়াবান! দেখ না, আমরা গরমে কষ্ট পাচ্ছি বলে শান্ত বাতাসটা বইয়ে আমাদেরকে আরামে ভাসিয়ে দিলেন। সারা দিন এবং সারা রাতও যদি সিজদায় পড়ে থেকে তাঁর গুণগান করি, তবুও তাঁর দয়ার এতটুকু আদায় করা শেষ হবে না।' কিন্তু কথাটা মুখ দিয়ে বের করতে পারল না। কেবল '... আমরা গরমে কষ্ট পাচ্ছি..' পর্যন্ত বলতে পেরেছে ও। এর মধ্যেই ঘটনাটা ঘটে গেছে।

পুরো ঘটনাটা ঘটতে মিনিট দুয়েক সময় লাগল।

ধাতস্থ হতে আরো প্রায় কুড়ি সেকেন্ড চলে গেল। কী ঘটে গেছে যখন বুঝতে পারল ও, তখন 'এই, এই তোমরা ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? থামো, থামো বলছি!...' বলে চিল্লাতে চিল্লাতে ছুটল বেশ কিছু দূর। মোড়ের মাথার পাঁচিলের ওখানে পৌঁছে বহু দূর পর্যন্ত রিকশাটাকে আর দেখা গেল না। তার মানে ওটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

দ্রুত মাথার মধ্যে কাজ করে চলছে বিপু ভাইয়ার মস্তিষ্ক। চালু হয়ে গেছে ওটা পুরো দমে। কিন্তু কোনো কিনারা করতে পারল না। বুঝতে পারল না কেন ওর সঙ্গীকে ওভাবে

তুলে নিয়ে গেল। কারা ছিল রিকশায় বা কয়জন ছিল, কিছুই বুঝল না। আসলে নিজেদের মধ্যে এতটাই মগ্ন ছিল ওরা, তথাপি গরমে হাঁফিয়ে উঠেছিল, তাতে আসলে ওসব কিছু খেয়াল করার সুযোগও ছিল না। ভীষণ কষ্টের মাঝে তৃপ্তির বাতাস শরীরে আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়াতে ওরা আসলে নিজেদের মধ্যে আরো কিছুটা ঢুকে গিয়েছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা, ওরা কি আর জানত যে এমন একটা ঘটনা ঘটবে? যদি জানত তাহলে তো প্রস্তুত হয়েই থাকতে পারতো।

কিন্তু এখন কী করবে বিপ্লব। এই এলাকার সবকিছু তো ও ভালোভাবে চেনেও না। মাত্র কয়েকদিন হলো বেড়াতে এসেছে। এসেই যথারীতি একটা রহস্যে জড়িয়ে পড়ে ও। পূর্ণ হয় রহস্যের সমাধানে বিপু ভাইয়ার সহকারী হওয়ার আবিদের বহু দিনের শখ। কিন্তু এটা কী হয়ে গেল? এখন কোথায় খুঁজবে আবিদকে? কোথায় নিয়ে গেছে ওকে ওরা?

ওদিক থেকে সাইকেল চড়ে একজনকে আসতে দেখে তাকে থামাল কিশোর গোয়েন্দা। জিজ্ঞেস করল একটা রিকশায় ওরই বয়সী একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছে কি না। তেমন কিছু খেয়াল করেনি বলে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল লোকটা।

দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল বিপ্লব। বামে আরেকটা সরু রাস্তা চলে গেছে। ওই রাস্তায় ঢুকে গেল ও। কিছু ছেলেপিলে ক্রিকেট খেলছে। এপাশে ফিল্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'এই যে ভাইয়া, এদিক দিয়ে একটা রিকশা যেতে দেখেছেন?'

ছেলেটা ওর দিকে কেমন কেমন করে যেন তাকাল। চোখ দুটো ভীষণ কটা তার। মাথার চুলগুলোও কেমন পাটের আঁশের মতো। রোগা ঢ্যাংঢেঙে শরীর। বলল, 'কে গো ভাই তুমি? আগে কখনো এদিকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না!'

বিপু পড়ল ভারি ফ্যাসাদে। আরে বাবা, ওর কি এখন এই সব খাজুরে আলাপের সময় আছে? ও যা জানতে চাইছে তা সরাসরি বলে দিলেই হয়। তা না,...

ওকে চুপ থাকতে দেখে ছেলেটা আবারও জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো, আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? কে তুমি?'

বিপ্লব এ কথারও কোনো জবাব দিল না। মনে মনে বলল, 'আরে খোকা, আমি কে তা শুনে তোমার কী দরকার? তুমি এদিক দিয়ে কোনো রিকশা যেতে দেখেছ কি না তা বলে দিলেই তো খেল খতম।'

ঠিক এই সময় ব্যাটসম্যান একটা বল এদিকে হাঁকাল। বিপ্লবের সাথে কথা বলছিল বলে বলটা মিস করল সে। ফলে চার রান হয়ে গেল। অন্য ফিল্ডাররা গেল ক্ষেপে। বলটা কুড়িয়ে ফেরত পাঠিয়ে এবার ছেলেটা বিপ্লবের দিকে রুখে দাঁড়াল। এমন ভঙ্গি করল যেন ওর জন্যই বলটা মিস ফিল্ডিং হয়েছে। তেড়ে এসে বলল, 'এই খুকা এই, তুমি কিডা? কেন এসেছ এদিকে? কী চায় তোমার? ও, কী যেন জিজ্ঞেস করছিলে, এদিক দিয়ে কোনো রিকশা যাতি (যেতে) দেখিছি কি না?' হা হা করে হাসল। 'তুমি কোন্ রিকশাডার কথা বলতিছাও? কত রিকশাই তো যাচ্ছে আসছে।' হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল তার চেহারা। 'এই মনু শোনো, ভালো চালি পরে এখেন থেকে কেটে পড়ো।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সেবাই প্রথম...

তামান্না হজ্জ গ্রুপ

IATA

তামান্না ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস

TAMANNA INTERNATIONAL TOURS & TRAVELS

আল রফিক ওভারসীজ, লাইসেন্স নং-৫২৩ কক্সবাজার ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস, লাইসেন্স নং-৭২৩

হজ্জ ও ওমরাহ বুকিং চলিতেছে....

যোগাযোগঃ ৫, ফেয়ার প্লাজা (৭ম তলা), মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
ফোনঃ ৯০১৩৬৬৩, ৯০১০৭৯৭, মোবাইলঃ ০১৭৭০৬২৪৫৫০-৪, ০০৯৬৬-৫৮৩৫৩৯৯০২ (মক্কা শরীফ)
Web: www.tamannaworldbd.com, E-mail: info@tamannaworldbd.com

তামান্না টয়েজ এন্ড ট্রেড লিঃ

তামান্না ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি পার্ক, ঢাকা

ঢাকা পার্ক অফিস ঃ
১০, গড়ান চটবাড়ী, বেড়ীবাঁধ রোড, (বোটানিক্যাল গার্ডেনের পশ্চিম পার্শ্বে), শাহ আলী মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। মোবাইল ঃ ০১৭৭০৬২৪৫৫৩, ০১৭৭০৬২৪৫৫৬-৭

তামান্না ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি পার্ক এন্ড পিকনিক কর্ণার, ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ পার্ক অফিস ঃ
আরাপপুর ক্যাডেট কলেজ রোড, চরমুরারীদহ, ঝিনাইদহ।
মোবাইল ঃ ০১৭৭০৬২৪৫৫৮,০১৭৭০৬২৪৫৫৫

নইলে কিন্তু...'

নইলে কী করবে তা ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করে বিশেষ ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল।

যা বোঝার বুঝে নিয়েছে বিপ্লব। সেখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। তবে বুঝল, এদিক দিয়ে যদি আবিদকে তুলে নিয়ে যাওয়া রিকশাটা যেত, তাহলে নিশ্চয়ই ছেলেদের নজরে পড়ত। এভাবে মনোযোগ দিয়ে খেলতে পারত না। তার মানে এই রাস্তায় যায়নি।

ফিরে এলো ও। শরীরটা হঠাৎ করেই আবার গরম হতে শুরু করল।

নানান প্রশ্ন মাথার ভেতরে ঢুকে ওর ভাবনাগুলোকে এলোমেলো করে দিল।

রাস্তার এই দিকটাতে ডানে একটা ছোট পুকুর। শান বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। পানি অনেকটা নিচে। পাশেই একটা জামরুল গাছ। সিঁড়ির বাম পাশটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। ওটার নিচে গিয়ে সিঁড়িতে বসল। পুকুরের শান্ত পানির দিকে তাকিয়ে থাকল বেশ কিছুটা সময়। প্রচণ্ড ক্লান্তি এসে ভর করছে শরীরে। কিন্তু এখন শরীরের কথা শুনতে গেলে চলবে না।

আবিদের কী হতে পারে, সম্ভাব্য কয়েকটা বিষয় ভেবে নিলো। তারপর হারিয়ে গেল কয়েকদিন আগের ঘটনায়।

দুই.

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। স্কুল দীর্ঘ ছুটি। এই ছুটিতে কোথায় কিভাবে কাটাবে তাই নিয়েই কথা হচ্ছিল ওদের মাঝে।

'কী ঠিক করলে? কোথায় যাবে এই ভ্যাকেশনে?' জিজ্ঞেস করল আবিদ।

'আমার চেনা একটা ভালো জায়গা আছে।' বলল বিপ্লব। 'ভাবছি, সেখানেই যাব।'

'কোথায় জায়গাটা?' জানতে চাইল আবিদ।

'স্বরূপদাহ। স্বরূপদাহ এই চৌগাছা উপজেলার একটি গ্রাম। খুবই সুন্দর। চারিদিকে সবুজের যেন চাদর বিছানো ওখানে।' বেশ উৎসাহ নিয়েই বলল বিপ্লব ওরফে বিপু ভাইয়া।

'সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু কে থাকে ওখানে? আর গুরুত্বপূর্ণ কী-ই বা আছে?' আরো জানতে চায় আবিদ।

'ওখানে আমার ফুফু বাড়ি।' সংক্ষেপে বলল বিপ্লব। ঠোঁটমুড়ে হাসল। অর্থাৎ কোনো রহস্য লুকাচ্ছে ও।

ওসব খেয়াল করল না আবিদ। আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বেরিয়ে গেছে মুখের ঝকঝকে সাদা দাঁত।

এই মুহূর্তে ওরা বসে আছে ফাঁকা একটা মাঠে একটা উঁচু টিবির ওপর।

সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। রোদের তেজটাও তাই কমে গেছে। মাথার ওপরে ছায়া মেলে ধরা মোটা গাছটায় দুটো হলদে পাখি কিচির মিচির করছে।

আবিদের মুখের হাসি লেগেই রইল। দারুণ খুশি হয়েছে ও, চেহারা দেখেই বোঝা যায়। গোয়েন্দাগিরিতে ইতোমধ্যেই বেশ সুনাম কুড়িয়ে নিয়েছে বিপ্লব খান। কোনো কেসে ওর সহকারী হিসেবে থাকতে পারাটা বেশ গর্বের বিষয়। আবিদের কখনো ওর সহকারী হয়ে ওঠা হয়নি। অথচ ওরই খেলার সাথী, স্কুলের সহপাঠীরা প্রায়ই বিভিন্নভাবে এই কিশোর গোয়েন্দাকে সহযোগিতা করে। এই তো, সৈকতটা তো কয়েকবারই ওর সহকারীর ভূমিকা পালন করল। ইশ্! ভাবে ও। একবার যদি কোনো একটা কেসে বিপ্লবের সহকারী হওয়া যেত!

কিন্তু ও ভেবে অবাক হচ্ছে, হঠাৎ কেন গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে ফুফু বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে বিপ্লব? নাকি ওখানে কোনো রহস্যের সমাধানের জন্যই যাচ্ছে? শোনা যায়, বিপু ভাইয়া যেখানে যায়, সেখানেই রহস্য এসে ওকে হাতছানি দেয়। না, এবার ওর সঙ্গ ছাড়াটা ঠিক হবে না। বলা তো যায় না, কোনো না কোনো একটা রহস্য যদি পেয়ে যায় বিপু, তাহলে তার সহকারী হওয়া আর ঠেকায় কে! সুতরাং, যেভাবেই হোক, ওর পিছ কিছুতেই ছাড়ছে না আবিদ।

ঘাসের একটা কচি ডগা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ছিল আবিদ। বিপ্লবের দিকে ফিরে বলল, 'কখন যাচ্ছি আমরা?'

বিপ্লব পাশেই সবুজ ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে ছিল। গাছের মগডালে পাখি দুটোর ঝগড়া উপভোগ করছিল। আবিদের কথায় ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'কাল সকালে।'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না আবিদ। বলল, 'কবে বললে?'

'টুমরো মর্নিং।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আবিদ। 'সত্যি? হুররে, আমার কী যে খুশি লাগছে!'

শোয়া থেকে উঠে বসল বিপ্লব। আবিদের দিকে কঠোর চোখে তাকিয়ে বলল, 'যাব আমি আমার ফুফু বাড়ি। কিন্তু তুমি অত খুশি হচ্ছো কেন?'

ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল আবিদ। লাফানো বাদ দিয়ে কাটা গাছের মতো ধপাস করে বসে পড়ল ঘাসের ওপর। বলল, 'মানে? আমি যাচ্ছি না তোমার সাথে?'

বিপ্লব কিছু বলল না। একইভাবে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

কাকুতি ঝরে পড়ল আবিদের কণ্ঠে, 'আমাকে সঙ্গে নেবে না তাহলে?'

চোখের পলক না ফেলে আবিদের চোখের দিকে তাকিয়েই রইল বিপ্লব। সে দৃষ্টি সইতে না পেরে ঘন ঘন পলক ফেলল আবিদ।

দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ সেকেন্ড একইভাবে রইল বিপ্লব। তারপর হঠাৎ করেই হা হা করে হেসে উঠল। হাসি যেন আর থামেই না।

আবিদ পড়ে গেল বেকায়দায়। ভাবতে শুরু করল, বিপুটা কি পাগল হয়ে গেল? এভাবে তো সাধারণত ওকে হাসতে দেখা যায় না। আজ হঠাৎ কী হলো ওর?

ও যখন ভাবতে শুরু করেছে যে, বিপ্লব আজ আর হাসি থামাবে না, ঠিক তখনই

বিপ্লব হঠাৎ করেই হাসি থামিয়ে আবিদের মাথায় একটা গাট্টা মেরে বলল, 'চলো'।

উঠে দাঁড়িয়েছে বিপ্লব। চলতে শুরু করল।

আবিদের ঘোর তখনও কাটেনি। ঠোঁট দুটো প্রায় দেড় ইঞ্চি ফাঁকা হয়ে রইল। তাকিয়ে আছে বিপ্লবের দিকে। এ কেমন অদ্ভুত মানুষরে বাবা! গোয়েন্দারা বুঝি এরকমই হয়?

পেছনে আবিদ আসছে না বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল বিপ্লব। ঘুরে এগিয়ে গেল ওর কাছে। রহস্যময় অদ্ভুত হাসিটি আবারও উপহার দিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, এখানে আর কতক্ষণ বসে থাকবে? আর যেভাবে হাঁ করে আছো, তাতে না কোন্ সময় মাছি ঢুকে যায় মুখের মধ্যে।'

'তুমি একাই যাবে?' একরাশ হতাশা ঝরে পড়ল আবিদের কণ্ঠে।

করুণা হলো বিপ্লবের। হাঁটু গেড়ে বসল ওর পাশে। দু'হাতে ওর দু'কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তুমিও যাচ্ছ আমার সাথে। তোমার বাবা-মাকে ম্যানেজ করে রেখেছি। কাল সকালেই একটা ব্যাগে টুকটাক কিছু জামা-কাপড় নিয়ে চলে এসো।'

চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে এলো আবিদের। ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল।

'এই, এটা কী হচ্ছে? কাঁদছো কেন তুমি?' জিজ্ঞেস করল বিপ্লব।

'খুশিতে কাঁদছি।' বলল আবিদ।

দূরে এক ঝাঁক বালিহাঁস গলার মালা তৈরি করে উড়ে যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে বিপ্লব বলল, 'দেখ দেখ, কী সুন্দর, তাই না?'

'খুব সুন্দর!'

'আর আমি?'

'তুমিও খুব ভালো। আমার আম্মুর মতো।'

'ধ্যাৎ, তোমার আম্মু তো অনেক ভালো। আমি গেলে তো আমাকে না খাইয়ে ছাড়েনই না। অবশ্য...'

'অবশ্য কী?'

'না কিছু না।'

'না বিপু ভাইয়া, তোমাকে বলতেই হবে।'

'না মানে বলছিলাম কি, মানে, ইয়ে মানে...'

'আমার কিন্তু কান্না পাচ্ছে।'

'এ মা, এই না কেবলই কান্না থামালে, আবার কেন?'

'তুমি না বললে আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেলব। তোমার মায়ের কাছে গিয়ে নালিশও করবো।'

'কী, কী নালিশ করবে?'

'সেটা তোমাকে বলবো কেন? তোমার মাকে গিয়েই বলবো।'

'ওকে, বলছি শোনো।' হার মানল বিপ্লব। 'তোমার আম্মু যখন আমাকে খেতে দেন, তখন তুমি অমন করে আমার দিকে তাকাও কেন? জানো, তোমাদের ওখান থেকে খেয়ে বাড়ি গেলে সেই রাতেই আমার ইয়ে শুরু হয়ে যায়!'

বিশেষ মূল্য ছাড়!

আপনি কী? আপনার ছেলে-মেয়েদেরকে স্বর্ণযুগের সোনালী মানুষের মতো গড়তে চান তাহলে তাদের নিয়ে গল্প আকারে রচিত বইগুলো আজই সংগ্রহ করুন।

শিশুতোষ বই ৩৫টি (১সেট) ৫০৭০ টাকা কমিশন ২৪০০ টাকা

১. যে অতীত প্রেরণা যোগায়-১ম ২য় গল্প। ২. ছোটদের বিশ্বনবী (স.)। ৩. ন্যায় বিচারের গল্প। ৪. পেতাম যদি এমন শাসক। গল্প ৫. শিশুতোষ পাঁচ পয়গম্বর- জীবনী। ৬. শিশুতোষ বাদশা সোলায়মান ৭. ফুটলো গোলাপ ইরান দেশে-জীবনী। ৮. ছোটদের হাসানুল বান্না। ৯. কুরআনের গল্প। ১০. হাদীসের গল্প। ১১. ছোটদের শেখ শাদী। ১২. মেধা বিকাশের সোপান। ১৩. কিতাবুস সালাত। ১৪. এসো কুরআন শিখি। ১৫. এসো হাদিস শিখি। ১৬. আবু বক্কর (রা.)। ১৭. ওমর (রা.)। ১৮. ওসমান (রা.)। ১৯. আলী (রা.)। ২০. খাদিজা (রা.)। ২১. আয়েশা (রা.)। ২২. ফাতেমা (রা.)। ২৩. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ২৪. আশারায়ে মুবাশশারা (রা.)। ২৫. আনাস ইবনে মালেক (রা.)। ২৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। ২৭. আবু হোরায়রা (রা) ২৮. সালমান ফারসি (রা) ২৯. হাসান হোসাইন (রা) ৩০. সেরা মুসলিম বিজ্ঞানী। ৩১. সেরা মুসলিম মনীষী। ৩২.ওমর ইবনে আবদুল আজীজ। ৩৩. নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন। ৩৪. ভাল মানুষের গল্প।

৩৩ টি বই (১সেট) ৪৮৫০ টাকা কমিশন বাদে ২২৫০ টাকা

১. আসান ফিকাহ-১ম ও ২য় খন্ড। ২. এন্তেখাবে হাদীস-(১, ২) একত্রে। ৩. রাহে আমল-১ম ও ২য় খন্ড। ৪. যাদে রাহ্। ৫. ফিকাহ মুহাম্মদী। ৬. মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার। ৭. কবীরা গুনাহ। ৮. গীবত বা পরনিন্দা। ৯. সকাল সন্ধ্যার শ্রেষ্ঠ আমল। ১০. কোরআন তিলাওয়াতের ফজিলত। ১১. পর্দা কি কেন পর্দা কর না? ১২. পয়গামে মুহাম্মদী। ১৩. কেয়ামতের বিভীষিকা-১-২। ১৪. বোখারা সমরকন্দের করুণ ইতিহাস।। ১৫. আদাবে জিন্দেগী। ১৬. ইসলামী আন্দোলনের কৌশল ও কর্মসূচি। ১৭. ইসলামে সামাজিক বিধান। ১৮. বাইবেল কোরআন বিজ্ঞান। ১৯. রাসূলুল্লার (স.) বিপ্লবী জীবন। ২০. জান্নাত লাভের উপায়। ২১. আল্লাহর পথে ব্যয় ১০০আয়াত ১০০ হাদিস। ২২. আমরা দাওয়াতি কাজ কীভাবে করবো? ২৩. কুরআন হাদীস সংকলন। ২৪. আল্লাহর রাসূল যে সব দু'আ ও জিকির পড়তেন। ২৫. লোকমান আ: ১০টি উপদেশ। ২৬. বোরকা ওড়না সাজসজ্জা। ২৭. তাওবার দরজা খোলা। ২৮. লজ্জা শরমের কথা ২৯. সামাজিক কাজ। ৩০. যেসব যুদ্ধে রাসুল সা. সেনাপতি ছিলেন। ৩১. মানুষের জিঙ্গাসা আল্লাহর জবাব

উপমহাদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী খন্দকার আবুল খায়ের (র.) লিখিত দারসে কুরআন সিরিজের ১-৫৬টি বই ১৬০০ টাকা

গাজী সালাহউদ্দীন আয়ূবীর দুঃসাহসী অভিযান নিয়ে রচিত ক্রুসেড সমগ্র (১,২,৩) মূল্য ২৪০০ টাকা ৫৫% কমিশনে ১০৮০ টাকা

নসীম হিজাযীও শফীউদ্দীন সরদার (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ২০টি বই কমিশন বাদে ২৭০০ টাকা

১. সীমান্ত ঈগল। ২. মহাবীর সুলতান মাহমুদ। ৩. কায়সার কিসরা। ৪. আধার রাতের মুসাফির। ৫. শেষ বিকালের কান্না। ৬. ইউসুফ বিন তাসফীন। ৭. হেজাযের কাফেলা। ৮. কিংসায়মনের রাজত্ব। ৯. ইরান তুরান কাবার পথে। ১০. ভারত যখন ভাঙ্গল। ১১. অপরাজিত। ১২. মানুষ ও দেবতা। ১৩. মুহাম্মদ ইবনে কাসীম। ১৪. মরণ জয়ী। ১৫. ভেঙ্গে গেলো তলোয়ার। ১৬. খুনরাঙ্গা পথ। ১৭. শেষ প্রান্তর। ১৮. পথহারা পাখী। ১৯ . অপূর্ব অপেরা। ২০. এক পাহাড়ী সন্তন।

নতুন সিলেবাসের কর্মী সাহিত্য ১৮টি ৬৫০ টাকা , সাথী সাহিত্য ৩০টি= ১৬০০টাকা ,সদস্য ৭৭টি বই= ৭৫০০, রোকন সদস্য সাহিত্য ৬৮টি হাদীস ৪টি= ৪১০০ এছাড়া ও সকল ধর্মীয় বই পেতে যোগাযোগ করুন।

ইসলামী ব্যাংক
সদর ঘাট শাখা।
চলতি হিসাব-৪৯৭৫

তাকিয়া বুক ডিপো

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

তাকিয়া বুক ডিপো

পাঠক বন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা।
বিকাশ ঃ ০১৭৯১-৭৪৮৮৬৬, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

ঢাকা ও কুরিয়ারে সারাদেশে বই পাঠানো হয়।

‘তার মানে? তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছো তোমার খাবারের দিকে আমি লোভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি?’

জবাবে চোখের পাতাগুলো বার কয়েক ওপর-নিচ করল বিপ্লব।

হাত উঁচিয়ে তেড়ে গেল আবিদ ওকে মারতে। বিপ্লব কি আর তখন ওখানে থাকে? ভোঁ-দৌড় দিয়েছে ও। পেছনে চিল্লিয়ে আবিদকে বলল, ‘কাল ভোর হতেই আমাদের বাড়িতে চলে এসো। আমরা এবার স্বরূপদাহ যাচ্ছি।

তিন.

পরদিন সকালবেলা।

বাসস্ট্যান্ড থেকে একটা এক্সপ্রেসে উঠল ওরা। সঙ্গে নিয়েছে দুটো পিঠব্যাগ। ভেতরে দরকারি জামাকাপড় ও অন্যান্য কিছু জিনিস। বিপ্লব সঙ্গে একটা চারফলা ছুরি নিয়েছে। বাড়ি থেকে বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলে সবসময়ই এটা কাছে রাখে। অনেক বার অনেক প্রয়োজনে কাজেও লেগেছে। আবিদ আসার সময় মা বলে দিয়েছেন, ‘সাবধানে থেকো। বাইরের খাবার একদম খাবে না কিন্তু।’

বাস এগিয়ে চলেছে পালবাড়ি রোড ধরে। থেকে থেকে রাস্তার দুই পাশে সবুজ মাঠ। গাছপালা। থেকে থেকে দোকানপাট, বাড়ি ঘর।

‘তোমার যখন ফুফু, তখন নিশ্চয় আমারও ফুফু।’ বলল আবিদ।

বিপ্লব কিছুই বলল না। কেবল ‘হ্যাঁ’ সূচক মাথা নাড়ল।

‘ফুফুকে ফোনে জানিয়েছো তো আমরা আসছি?’

‘না।’ সংক্ষিপ্ত জবাব বিপ্লবের।

‘না? কেন?’ একটু যেন অবাক হলো আবিদ।

‘হ্যালো নেই।’

‘হ্যালো মানে?’ আরো অবাক হলো আবিদ। মাঝে মাঝে বিপ্লব এমন সব উদ্ভট কথা বলে যে আবিদ তার কিছুই বোঝে না। এই যেমন এখন বলল ‘হ্যালো নেই’।

‘আহা! এই কথাটুকুও তুমি বুঝতে পারো না? তাহলে গোয়েন্দাগিরি করবে কিভাবে?’

আবিদ বুঝতে পারে না গোয়েন্দাগিরি করতে এই উদ্ভট কথাটার মানে বোঝার দরকার কেন? মুখ গোমড়া করে বসে থাকল ও। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

বিপ্লব লাল শার্ট আর সাদা প্যান্ট পরেছে। আবিদ একটা হালকা লাল শার্ট আর কালো প্যান্ট পরেছে। বেশ পরিপাটি ফিটফাট লাগছে ওদেরকে।

‘রাগ করেছ আবিদ?’ বিপ্লব জিজ্ঞেস করল।

এবার আবিদ কোনো কথা বলল না। আগের মতই চুপ করে বসে থাকল।

'আবিদ রাগ করো না বন্ধু। আমি জাস্ট ফান করছিলাম তোমার সাথে।' আবিদকে চুপ থাকতে দেখে বলল বিপ্লব।

এবারও কোনো কথা বলল না আবিদ।

'শোনো, ফুফু বাড়িতে কোনো হ্যালো নেই মানে...'

'কোনো ফোন নেই, এই তো?' বিপ্লবকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল আবিদ।

'এই তো তুমি বুঝতে পেরেছ। তাই তো বলি, আমার বন্ধু এ কথার মানে না জেনে পারেই না। নাহ্, তুমি কিশোর গোয়েন্দা বিপু ভাইয়ার সহকারী হওয়ার যোগ্যতা রাখো।' বলে বিশেষ ভঙ্গিতে আবিদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে লাগল বিপ্লব।

কিছুক্ষণ ওর হাসির দিকে তাকিয়ে রইল আবিদ। হাসি ওর চোখে-মুখেও ছড়িয়ে পড়ল। হো হো করে হেসে উঠল।

ঠিক এই সময় তীক্ষ্ণ ব্রেক কষলো বাস। আর একটু হলেই সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল দু'জনে। সামনের ছিট ধরে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচল ওরা।

'কী হলো!' আবিদের গলা শুকিয়ে গেছে। কথাটা ফ্যাঁসফ্যাঁস করে বের হলো। 'এমন করে ব্রেক চাপল কেন?'

পাশ থেকে একজন ভদ্রলোক বললেন, 'একটা লোক রাস্তা পার হচ্ছিল। তাকে বাঁচাতে গিয়েই কড়া ব্রেক কষেছে ড্রাইভার।'

আশ্বস্ত হলো বিপ্লব আর আবিদ। সেই সাথে অন্য প্যাসেঞ্জারও।

আবার চলতে শুরু করল গাড়ি। উঁচু একটা পুল পার হলো। ঝাঁকি খেল সারা শরীর।

'তাহলে তুমি ফুফুকে জানাওনি?' আগের কথায় ফিরে এলো আবিদ।

'একটা সারপ্রাইজ দেব বলে জানাইনি। তবে আগেই জানিয়ে রেখেছি যে এবারের ছুটিটা আমি ওখানে কাটাব।' জবাবে বলল বিপ্লব।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল আবিদ। নাক দিয়ে বাতাস বের হবার সময় 'ফোঁস' করে শব্দ হলো। হেসে উঠল বিপ্লব।

চুড়ামনকাঠি বাজারে এসে বাস থামল। কিছু প্যাসেঞ্জার উঠল, কেউ কেউ নেমে গেল।

'আর কত দূর স্বরূপদাহ?' আবিদের প্রশ্ন।

'আর এই তো অল্প দূর। চলে এসেছি প্রায়।'

বাস চলতে শুরু করল আবার।

কথা আর বেশি এগোল না। সকালে হালকা নাশতা সেরেই উঠেছিল। এক্ষণে তাই ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। আবিদের মা ব্যাগের ভেতরে আলু ভাজি আর পরোটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। দু'জনে ভাগ করে খেল ওরা।

ওরা যখন বাস থেকে নামল, তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে।

'এবার হাঁটতে হবে।' ঘোষণা করল বিপ্লব।

থমকে দাঁড়াল আবিদ। হাঁটাতে ওর ভীষণ বিরক্তি।

বুঝতে পেরে বিপ্লব বলল, 'ফেরার বাস এখনি পেয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারো।'

কিন্তু আবিদ সেটা চায় না। অনেক আশা নিয়ে বিপ্লবের সাথে এসেছে ও। এত দূর এসে এখন ফিরে যেতে কে-ইবা চায়? হোক না একটু হাঁটাহাঁটি। হাঁটা তো একটা ভালো ব্যায়াম। এটা ব্যায়াম মনে করে কিছুটা হাঁটলে এমন কিছু হয়ে যাবে না।

পাশাপাশি হাঁটতে লাগল দুই কিশোর। কিন্তু তখনও জানে না, স্বরূপদাহ গ্রামে ওদের জন্য কী চমকটাই না অপেক্ষা করছে। জটিল রহস্যের জ্বালে জড়িয়ে যেতে চলেছে তা টেরই পায়নি।

চার.

দুইজনের পিঠে দুটো পিঠব্যাগ ঝুলিয়ে হাজির হলো ওরা বিপ্লবের ফুফু বাড়ির সামনে। ইটের দালান, টালির চালা। একতলা বাড়ি। দেখলেই বোঝা যায় অনেক পুরনো। পলস্তারা খসে গেছে জায়গায় জায়গায়। বেরিয়ে পড়েছে লাল ইট।

বাড়িটা দক্ষিণ পাশে রেখে পূর্ব পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকল দুই কিশোর গোয়েন্দা। ছোট্ট গেটটা খোলাই ছিল। ভেতরে খানিকটা জায়গা জুড়ে বারান্দা। বারান্দার সামনে কিছুটা ফাঁকা জায়গা–উঠান, উঠানের ওপাশে একটা ঘর।

ছোটখাটো ঘর। রান্নাঘর ওটা। ঘরের উত্তর পাশে গাছপালা, ছোট একটা বাগান বলা চলে ওটাকে। তবে মাঝারি ও ছোট আকৃতির গাছই বেশি।

বিপ্লব আর আবিদ উঠানে পা দেওয়ার সাথে সাথে ছোট্ট ফুটফুটে একটি মেয়ে, বয়স বারো তেরো হবে, ঘরে দৌড়ে গিয়ে তার মাকে ডাকাডাকি করতে লাগল, 'মা, মা, দেখ বিপু ভাইয়া এসেছে।'

আবার বাইরে চলে এলো সে। বিপ্লবের পাশে এসে দাঁড়াল। আনন্দে যেন ভাসছে। এই বিপু ভাইয়াকে ও খুব পছন্দ করে। ওদের বাড়িতে গেলে তো সারাক্ষণ ওর পিছই ছাড়ে না। বিপ্লবও ওকে আদর করে অনেক।

আবিদকে দেখিয়ে বলল মেয়েটি, 'ও কে, বিপু ভাইয়া?'

'পরে বলব সুমি আপু।' ওকে কোলে তুলে নিয়ে বলল বিপ্লব। পিঠব্যাগ থেকে আগেই হাতে নিয়ে রাখা ডার্ক চকোলেটটা ওর হাতে দিল। 'চলো, আগে ভেতরে যাই।' বলে যেতে উদ্যত হলো।

'এ কিরে বিপ্লব, না বলেই চলে এলি? আয় আয়, ভেতরে আয়। লম্বা জার্নি করেছিস। কত ধকল গেছে তোদের ওপর দিয়ে। আয় আয়?' দরোজায় দাঁড়িয়ে মুখস্থ করা বিদ্যার মত আউড়ে গেল বিপ্লবের ফুফু। অন্যদের কথা বলার কোনো সুযোগই দিল না।

ভেতরে ঢোকার সময় বিপ্লবের ফুফু আবার বলল, 'আমাকে আগে জানালেই তো

পারতি। বাসস্ট্যান্ডে লোক পাঠিয়ে দিতাম।'

'তোমাকে সারপ্রাইজ দেব বলে আগে জানাইনি ফুফু।' এতক্ষণে মুখ খোলার সুযোগ পেল বিপ্লব।

'তা যা বলেছিস। আমি তো দারুণভাবে সারপ্রাইজড হয়েছি।' বলল ফুফু।

সুন্দর করে সাজানো ঘরটা। আসবাবপত্র তেমন নেই। কেবল একটা কাপড় রাখার আলনা, একটা টেবিল ও দুটো চেয়ার এবং একটা শোবার খাট আছে। আর হ্যাঁ, খাটের সোজা ওপরে একটা বৈদ্যুতিক পাখা আছে।

ফুফু গিয়ে সিলিং ফ্যানের সুইচ অন করে দিলেন। ধীরে ধীরে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় স্পিড নিয়ে ঘুরতে লাগল ফ্যান।

চেয়ারে নয়, খাটেই বসল ওরা। ফুফুও ওদের পাশে বসল। 'খুব তো বললি নিজেরাই তো চলে এলাম। যদি গুণ্ডারা ধরত তোদের, তাহলে?'

'আজকাল বুঝি এদিকে গুণ্ডাদের খুব উৎপাত হচ্ছে?' জানতে চাইল বিপু ভাইয়া।

'তবে আর বলছি কী! তোরা জানিস এখানে কী ঘটছে?' বলেই কেমন রহস্যজনকভাবে থেমে গেল ফুফু। পালা করে তাকাতে লাগল ওদের দিকে।

সুমি সেই যে বিপ্লবের কোলে উঠেছে, এখনও নামেনি। এবার বিপ্লব ওকে আস্তে করে নামিয়ে পাশে বসিয়ে ফুফুর দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিল। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করল, 'কী ঘটছে ফুফু?'

'আর বলো না ভাইয়া,' মা কিছু বলার আগেই বলে উঠল সুমি। 'সেদিন সকাল আটটার সময় চৌরাস্তার মোড়ে দুটো গুণ্ডা একজনকে ধরল। আর সে কী গণ্ডগোল!'

কেমন তেরছা করে ওর দিকে তাকাল বিপ্লব। বোঝার চেষ্টা করল মেয়েটা কী বলতে চাইছে। কিন্তু ওর মুখের ভাষা কেন যেন পড়তে পারল না। শিশুরা নিষ্পাপ হয়। তাহলে তো তাদের মুখের ভাষা সহজেই বুঝতে পারার কথা। ও তো কত কত ক্রিমিনালের মুখের ভাষা অল্পতেই পড়ে ফেলতে পারে। তাহলে এই মেয়েটার মুখের ভাষা পড়তে পারছে না কেন?

কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল ওর।

বিপ্লব এবার একটু নড়ে উঠল। সরাসরি তাকাল ফুফুর দিকে। সতর্ক হয়ে উঠেছে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। বলল, 'ব্যাপারটা খুলে বলবে ফুফু?'

আবিদও শোনার জন্য একটু সামনে ঝুঁকে এলো।

ফুফু আর ওদেরকে ঘোরের মধ্যে না রেখে বলল, 'দিনকাল খুব ভালো যাচ্ছে না রে। দাঁড়া, আগে তোদেরকে লেবুর শরবত করে দিই। খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ, তারপর বলছি।'

'কিন্তু ফুফু...'

বিপ্লবকে কথা শেষ করতে দিল না ফুফু। উঠে গেল লেবুর শরবত বানাতে।

বিপ্লব তখন উত্তেজনায় ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে। আসল ব্যাপারটা না শুনলে ওর নার্ভগুলো আর শান্ত হবে না বোঝা-ই যায়। এই মুহূর্তে মৃদু ঘামছে ও। মাথার ওপরে সিলিং ফ্যান হালকা 'গো গো' শব্দে বাতাস দিয়ে চলেছে। তা সত্ত্বেও এই ঘামের চিকন ধারাটা ওর দুই জুলফির পাশ ঘেঁষে গড়িয়ে পড়তে লাগল। [চলবে]

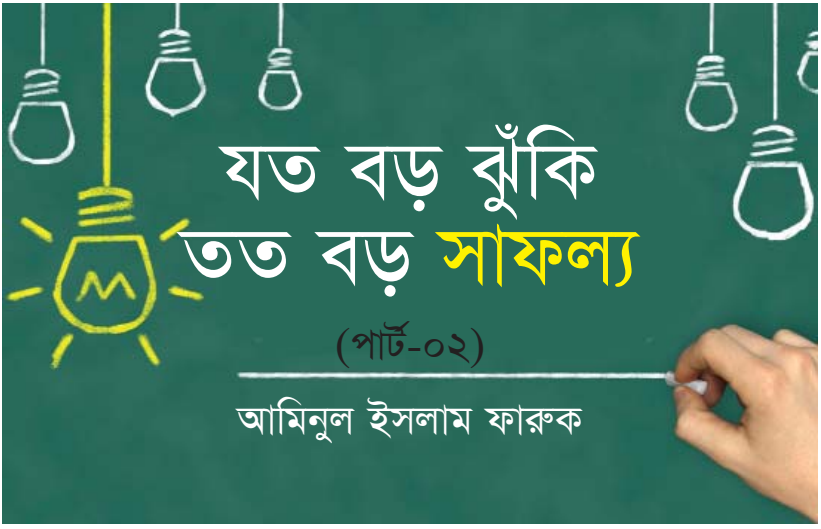

যত বড় ঝুঁকি তত বড় সাফল্য

(পার্ট-০২)

আমিনুল ইসলাম ফারুক

খুব কম লোক সাহসী হয়ে জন্মান। নতুন কোন কাজে ঝুঁকি নেয়ার মতো মনোবল এবং সাহস খুব কম লোকেরই থাকে। এমন কিছু মনীষীর আগমন পৃথিবীতে ঘটেছিল, জীবন নিয়ে যাদের ঝুঁকি এবং সাহসিকতাপূর্ণ কাজ গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তেমনি এক বীর পুরুষ ক্রিস্টোফার কলম্বাস (১৪৫১-১৫০৬)। তাঁর চ্যালেঞ্জিং জীবনের কিছু কথা বলছি–

ছোটোবেলা থেকে কলম্বাসের সমুদ্র অভিযানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার মানসে দিনের বেশির ভাগ সময় তাঁর লাইব্রেরিতে কাটতো দেশ-বিদেশের নানান ভ্রমণ কাহিনী পড়ে। যৌবনের প্রায় পুরো সময়টা তাঁর কেটেছে সমুদ্র অভিযানের সব রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়ে। এই সময়ে একদিন তাঁর হাতে এলো মার্কো পোলোর লেখা চীন ভ্রমণের ইতিবৃত্ত। বইটি পড়তে পড়তে মনের মধ্যে প্রাচ্য দেশে যাবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন কলম্বাস। এর পেছনে কাজ করছিল মূলত দুটি শক্তি। প্রথমত, রোমাঞ্চকর অভিযানের দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা; দ্বিতীয়ত স্বর্ণতৃষ্ণা। তখন মানুষের ধারণা ছিল প্রাচ্য দেশের পথেঘাটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অফুরন্ত হীরে জহরৎ, সোনা-রূপা, মণি-মুক্তা। সে দেশের মানুষের কাছে তার কোনো মূল্যই নেই। ইচ্ছে করলেই তা জাহাজ বোঝাই করে আনা যায়।

কলম্বাস তাঁর সমুদ্র অভিযানের

প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করলেন কিন্তু বিপত্তি বাধলো অন্য জায়গায়। তাঁর ইচ্ছের কথা শুনে প্রায় সকলেই এই অভিযান অবাস্তব এবং অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা পর্যন্ত উপহাস করল। তাঁর কোনো কোনো বন্ধু তাঁকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ না করে ছাড়ল না। একটি মানুষও এগিয়ে এলো না তাঁর সাহায্যে। কলম্বাসের অনুরোধে স্পেনের রানী ইসাবেলা সহৃদয় বিবেচনার আশ্বাস দিলেও সম্রাট ফার্দিনান্দ কলম্বাসের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন।

ইতোমধ্যে তাঁর জীবনসঙ্গিনী ফেলিপা দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর বিনা চিকিৎসায় মারা যান। কলম্বাসের জীবনের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস

পরিবারের মায়া ত্যাগ করে এবার নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর আকাশকুসুম অভিযান বাস্তবায়নের জন্য। দেশের প্রায় প্রতিটি ধনী মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ান আর বলতে লাগলেন, জাহাজ চাই; নাবিক চাই; অর্থ চাই। কলম্বাসের দাবি ছিল, যে দেশ তিনি আবিষ্কার করবেন তাঁকে সেই দেশের ভাইসরয় করতে হবে এবং রাজস্বের একটি বড় অংশ তাঁকে দিতে হবে। প্রাথমিকভাবে দুয়েকজন সম্মতি দিলেও কলম্বাসের দাবির কথা শুনে প্রায় সকলেই তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু কলম্বাস হাল ছাড়লেন না। হঠাৎ এরই মধ্যে একদিন কলম্বাসের সাথে পরিচয় হলো ফাদার পিরেজ-এর। ফাদার পিরেজ ছিলেন রাজ পরিবারের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং রানী ইসাবেলা তাঁকে বেশ সম্মান করতেন। কলম্বাসের ইচ্ছের কথা ফাদার পিরেজ রানী ইসাবেলার কাছে বললে ফাদারের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না রানী ইসাবেলা। নতুন দেশ আবিষ্কারের সাথে সাথে বহু মানুষকে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার পুণ্য অর্জন করা যাবে। ফাদার পিরেজ ছাড়া আরও কয়েকজন সুহৃদ ব্যক্তি কলম্বাসের সমর্থনে এগিয়ে এলেন। শর্তসাপেক্ষ কলম্বাসের সব অনুরোধ মেনে নিলেন সম্রাট।

১৪৯২ সালের ১৭-ই এপ্রিল তাদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কলম্বাস যে দেশ আবিষ্কার করবেন সে দেশের শাসনভার দেওয়া হবে তাঁকে। তার সাথে সেই দেশ থেকে অর্জিত সম্পদের এক-দশমাংশ অর্থ দেওয়া হবে তাঁকে। সম্রাটের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে

তিন তিনটি বিশাল জাহাজ নির্মাণ করলেন কলম্বাস। সবচেয়ে বড় ১০০ টন ওজনের 'সান্তামারিয়া', 'পিন্টা' ৫০ টন এবং 'নিনা' ৪০ টন। ৮৭ জন নাবিক নিয়ে হতাশার অবসান ঘটিয়ে ৩ আগস্ট ১৪৯২-এ কলম্বাস পাড়ি জমালেন এক নিরুদ্দেশ যাত্রায়। সেদিন বন্দরে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের প্রায় সবাই ভেবেছিল- একজনও আর সেই অজানা দেশ থেকে ফিরে আসবে না। অথৈ সমুদ্রে ভেসে চললেন কলম্বাস। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হয় কিন্তু কোথাও কোনো স্থলের চিহ্নমাত্র নেই। অধৈর্য হয়ে ওঠেন নাবিকেরা। নাবিকেরা সবাই একত্রিত হয়ে কলম্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেন- জাহাজ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কলম্বাসের চোখে পড়ল ভাঙা গাছের ডাল। সবুজ পাতা। অনুমান করতে আর কষ্ট হলো না, তারা কোনো স্থলের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন। নাবিকদের কাছে শুধু একটি দিনের প্রার্থনা করেন কলম্বাস। দিনটি ছিল ১৪৯২ সালের ১২ অক্টোবর। একজন নাবিক, নাম রডরিগো প্রথম দেখলেন স্থলের চিহ্ন। আনন্দ আর উল্লাসে মেতে উঠলেন সকলে। তারা যে দ্বীপটিতে প্রথমে পা রাখেন তার নাম ছিল বাহামা দ্বীপপুঞ্জ। পরবর্তীকালে তিনি সেই দ্বীপের নাম রাখেন 'সান সালভাদর' যার বর্তমান নাম ওয়েস্টলিং আইল্যান্ড। এই দিনটি আজো উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় কলম্বাস দিবস হিসেবে অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের সাথে উদযাপন করা হয়।

কলম্বাসের সমুদ্র অভিযানের এই যাত্রা মোটেও সহজ ছিল না, ছিল দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ। তাঁর সমুদ্র যাত্রার এই ঝুঁকিও কোনো সাধারণ ঝুঁকি নয়। কিন্তু কলম্বাস সমুদ্র জয় করবেন এটা ছিল তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন। কলম্বাস সে স্বপ্নের কথা তাঁর জবানীতে এভাবে বলেছেন- 'Goals are simply tools to focus your energy in positive directions,

তারা যে দ্বীপটিতে প্রথমে পা রাখেন তার নাম ছিল বাহামা দ্বীপপুঞ্জ

সেপ্টেম্বর মাসব্যাপি

৫০% কমিশনে

আপনি কি?
আপনার সন্তানকে সৎ, চরিত্র ও আদর্শবান হিসেবে গড়তে চান?
তা হলে, গল্প আকারে রচিত বইগুলো সংগ্রহ করুন।

নিম্নে উল্লেখিত ২৬টি বই দাম ৩৬৬৫/- এখন ১৮০০ টাকা

১. আল কুরআনের গল্প, ২. ছোটদের প্রিয় নবী (স.), ৩. হাদীসের গল্প, ৪. ছোটদের মূসা নবী (আ:), ৫. হযরত ওমর (রা.) গল্প কথা, ৬. ছোটদের হযরত আলী, ৭. আবাক সেনাপতি, ৮. ছোটদের শেখ সাদী, ৯. খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ, ১০. এখনি ফিরে এসো, ১১. ছাত্রদের বলছি, ১২. বিশ্বনবীর উপদেশ, ১৩. ছোটদের আদর্শ মহানবী মুহাম্মদ (সা.), ১৪. হে বোন তোমাকে বলছি, ১৫. চরিত্র গঠনের নামাযের ভূমিকা, ১৬. রহস্যের চাদর, ১৭. পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০টিপস, ১৮. খালিদ বীন ওয়ালীদ, ১৯. স্পেন বিজয়ী মূসা, ২০. গ্রানাডার শেষ বীরের গল্প, ২১. হযরত আয়েশা ও উম্মে আয়মান (রা.), ২২. গল্পে গল্পে ছোটদের ৩৬৫ দিন, ২৩. শিকলপড়া হাতের পরশ, ২৪. মাকে খুশি করার ১৫০টি উপায়, ২৫. দৈন্দিন জীবনের পর্দা, ২৬. ছোটদের ইউনুস নবী (আ.)। **প্যাকেজ ১**

৬৭৯০ টাকায় নিম্নোক্ত ৩১টি বই এখন ৩৩০০ টাকা

১. রিয়াদুস সালেহীন-১-৪, ২. এন্তেখাবে হাদীস (১-২ একত্রে), ৩. রাহে আমল ১-২, ৪. আসান ফেকহ ১-২, ৫. ফিকাহ্ মোহাম্মদী, ৬. পয়গামে মোহাম্মদী আটটি ভাষণ, ৭. কবিরা গুনাহ্, ৮. মাতাপিতা সন্তানের অধিকার, ৯. রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন, ১০. বিশ্বশান্তি ও ইসলাম, ১১.মহিলা সাহাবি , ১২. ইসলামের সৌন্দর্য, ১৩. কুরআন হাদিসের আলোকে জ্যোতির ভাষ্য, ১৪. জান্নাত লাভের উপায়, ১৫. ইসলামের সামাজিক বিধান, ১৬. দারসূল কোরআন (শেষ ১৪ সূরা), ১৭. ইসলামী আন্দোলন ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল, ১৮ দৈনন্দিন জীবনে পর্দা, ১৯. আদর্শ পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ২০. ৩৬৫ দিনের ডায়েরি (কোরআন,হাদিস ও দোয়া), ২১. হাসীদের পরিচয় ও ইতিবৃত্ত, ২২. বিশ্ব নবী (সা.)-এর অমিয় বানী ১, ২, ২৩. আদাবে জিন্দেগী, ২৪. আল্লাহর ভয়ে কাদা, ২৫. রাসূলুল্লাহর (স) নামায। **প্যাকেজ ২**

বিশেষ সেট

১৩টি বই মূল্য ৭১২ টাকা এখন ৩৫০ টাকা মাত্র।

১. মজবুত ঈমান। ২. চক্ষু শিতরকারী পরিবার গঠন। ৩. জান্নাত লাভের উপায়। ৪. নির্বাচিত আয়াত হাদীস সংকলন। ৫. কবরের ৩টি প্রশ্ন জীবনের মূল মন্ত্র। ৬. নামায কেন কবুল হয় না। ৭. ইহকাল থেকে পড়কালে। ৮. জবানের গুনাহ। ৯. আদর্শ সমাজ গঠনে মহিলাদের দায়িত্ব। ১০. দৈনন্দিন জীবনে পর্দা। ১১। চরিত্র গঠনে নামাজের ভূমিকা। ১২. মানুষের কাজেই আসে গজব? বাচার উপায় কি। ১৩. আখেরাতের প্রস্তুতি। **প্যাকেজ ৩**

নতুন সিলেবাসের আলোকে ৩টি প্যাকেজ

১. কর্মী, তাফহীম ২টি, হাদিস ১টি, সাহিত্য ১৬টি ৮০০ টাকা।
২. সাথী, তাফহীম ১১টি, হাদিস ৪টি, সাহিত্য ৩০টি ৩২০০ টাকা।
সাথী সাহিত্য (পাঠ্য ৩০টি বই) ১৬৫০ টাকা।
৩. সদস্য, কুরআন হাদীসসহ ১২৫০০ টাকা, সাহিত্য (৮০টি বই) ৭৭০০ টাকা।

রুকন (সদস্য) শিক্ষিত বই ৬৭টি, হাদীস ৪টি ৪২০০ টাকা মাত্র।
সল্প শিক্ষিত বই ৩৪টি, তাফহিম ১টি, হাদীস ২টি ১৭০০ টাকা মাত্র।
কর্মী বই ৩০টি, তাফহিম ১টি হাদীস ২টি ১২০০ টাকা মাত্র।

আজই আপনার চাহিদা জানিয়ে অর্ডার দিন আমরা আছি আপনার পাশে

এছাড়াও পাবেন:
১. তাফসীরে ফী জিলালিল কুরআন ১-২২ খণ্ড ৩২০০, তাফসীরে ইবনে কাসির ১-৮ খণ্ড ৩০০০ টাকা।
২. তাফহীমূল কুরআন ১–১০ খণ্ড, ১-১৯ খণ্ড।
৩. কুরআনের পয়গাম ১-৩ খণ্ড,
৪. শব্দার্থে কুরআন- ১–১০।
৫. শব্দে শব্দে কুরআন ১-১৪ খণ্ড।
৬. সহীহ বুখারি ১–৬ খণ্ড।

ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিসে বই পাঠানো হয়

ফাহিম বুক ডিপো

ফাহিম বুক ডিপো

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল ঃ ০১৯৮১-১৪৩১১১, ০১৭১২-২৮৭৬৯৫ (বিকাশ) ০১৯৮১-১৪৩১১১৪ (রকেট)
E-mail: fahimbookdepo11@gmail.com,
FB: Facebook.com/Fahimbookdepo.official

ইবনে খালদুন

these can be changed as your priorities change new one added and others dropped.'

সমুদ্র অভিযান নিয়ে তিনি আরও একটি অসাধারণ কথা বলেন– 'The sea will grant each man new hope, and sleep will bring dreams of home.'

মনে রাখবে, জীবনের গতিপথে অনেক ঝুঁকি রয়েছে। যেগুলো অতিক্রম করে সামনের দিকে এগোতে হয়। ঝুঁকি নেয়াটা না যত বড় বিপদ, তারচেয়েও বড় বিপদ ঝুঁকি না নিয়ে বেঁচে থাকা। যে মানুষ জীবনে ঝুঁকি নেয় না বলা চলে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। সে নিজে কিছু শেখে না অন্যকেও শেখাতে পারে না। নিজে পরিবর্তন হয় না এবং অন্যকেও পরিবর্তন করতে পারে না। সে কাউকে ভালোবাসতে পারে না এবং কারো ভালোবাসা পায় না। সর্বোপরি শেষ পর্যন্ত সে আর বাঁচে না। বিশ্বখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা ও মানবতাবাদী নেতা মুহাম্মদ আলী ক্লে বলেছেন- 'He who is not courage enough to take risks will accomplish.'

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন একটি দারুণ কথা বলেছেন- 'Life is all about taking risks, if you never take a risk you will never achieve your dreams.'

সবচেয়ে মজার কথাটি বলেছেন ব্রাজিলের বিখ্যাত লেখক পাওলো কোহেলহো- 'Be brave take risks.

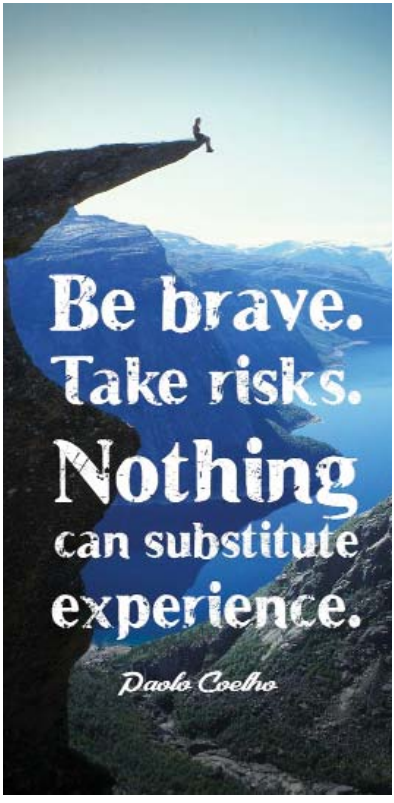

Nothing can substitute experience.'

এই চারটি ঝুঁকি জীবনে সবারই নেয়া উচিত

এক. ভয় মোকাবেলার ঝুঁকি

যে বিষয় তোমার অত্যন্ত ভয় কাজ করে তেমন একটি ভয়কে আজই মোকাবেলা করা শুরু করো। এটি তোমাকে নিজের গণ্ডি থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করবে।

যেমন, ধরো তুমি গণিতে দুর্বল, গণিত বই দেখলেই ভয়ে কুঁকড়ে যাও, তো আজই গণিত প্র্যাকটিস শুরু করো। প্রয়োজনে একজন শিক্ষকের সাহায্য নাও। সেটা সম্ভব না হলে ইউটিউব এর সাহায্য নাও। এভাবে তিন মাস চালিয়ে যাও। দেখবে নিজের ভয় তো দূর হবেই এবং তুমি গণিত করতে বেশ আনন্দ পাচ্ছো।

দুই. ব্যতিক্রম কিছু করো

যে কাজটি কেউ করেনি এবং যা অন্যের কাছে হাস্যকর হতে পারে তুমি সেটাই করো। অন্যেরা যে কাজকে ভয় করে, অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেয় তুমি তেমনই একটি কাজে এগিয়ে যাও। এ কাজটি যে উঁচু কোনো পর্বত জয় করা কিংবা দুঃসাহসী কোনো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে করতে হবে ব্যাপারটি এমন নয়। এটি হতে পারে নতুন কোনো বিষয়ে শিক্ষার জন্য ভর্তি হওয়া কিংবা পেশাদারি বড় কোনো কাজে ঝুঁকি নেয়া।

এমন একটি কাজে যদি তুমি সফল হতে পারো তাহলে তোমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে বহুগুণ। এটি তোমাকে আরও বড় কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করবে।

তিন. ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করো

অনেকেই বড় কোনো ভুলের দায় স্বীকার করতে চায় না, করে না। বড় কোনো ভুল হয়ে গেলে একে অপরকে দায়ী করার প্রবণতা দেখা যায়। তবে তুমি যদি এমন কোনো পরিস্থিতিতে পড় তাহলে সে ভুলের জন্য অকপটে দায় স্বীকার করে নেবে। এটি তোমার জন্য একটি অত্যন্ত সাহসী এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, তবে এ ঝুঁকি তোমার উন্নতির নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। অবশ্য এ কাজ সবাই পারে না, এটি করতে উন্নত চরিত্র ও বুকে হিম্মত লাগে। এ ছাড়া পরিস্থিতি এমনও হতে পারে যে, অন্যকে দায়ী করার পরও দোষ তোমার নিজের দিকেই ইঙ্গিত করতে পারে। এক্ষেত্রে ভুল হয়ে গেলে আগেই দোষ স্বীকার অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ। পরিস্থিতি যতই নাজুক হোক না কেনো, বড় কোনো ভুলের পর তা থেকে পালিয়ে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। ভুল স্বীকার করে নেয়ার কারণে হয়তো ঐ সমস্যাটির একটি স্থায়ী সমাধান হয়ে যেতে পারে। এটি যেমনিভাবে তোমার মানসিকতার যথেষ্ট উন্নতি করতে সাহায্য করবে তেমনি ভবিষ্যতে অনেক ভুল থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

চার. অন্যকে সাধ্যমতো সাহায্য করো

তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, এর তুলনায় বহু মানুষের অবস্থা যে খারাপ তা চোখ বন্ধ করে বলা যায়। তোমার হয়তো আক্ষেপ তোমার জুতো নেই অথচ তোমার পাশের অনেকের পা নেই। চশমা কিনতে পারো না বলে হয়তো তোমার আক্ষেপ অথচ তোমার পাশের

তোমার স্থির দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো সুযোগ নেই। যদি জীবনকে এগিয়ে নিতে চাও তাহলে নিজের আরামদায়ক এলাকা থেকে বের হয়ে আসো। ঝুঁকি নাও এবং প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও যতক্ষণ না সফল হচ্ছো

বন্ধুটিরই চোখ নেই। সুতরাং যে মানুষ সমস্যার ভেতর আছে তাকে সাধ্যমতো সাহায্য করা। তোমার একটু সহানুভূতি ও প্রচেষ্টা একজনের যে উপকার করতে পারে তার মূল্য অন্য কোনোভাবে প্রকাশ করা যায় না। এ জন্য কিছু কিছু বিষয় একটু ভিন্নভাবে ভাবা প্রয়োজন। অন্যদের দিকে একটু সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকানো প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে এ পরিস্থিতি তোমারও একদিন হতে পারে এবং হবেই। নবী (সা.) বলেছেন- 'যে পেটপুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী না খেয়ে কষ্ট পায় ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়।' (আল আদাবুল মুফরাদ-১১২)

নবী (সা.) আরও বলেছেন, 'মহান আল্লাহ্ তায়ালা ও আখিরাতের প্রতি যে ঈমান রাখে সে যেনো প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।' (সহিহ মুসলিম-১৮৩)

প্রতিটি মানুষের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে একটি মেধাবী মানুষ। ঠিক তুমিও এর বাইরে নও। যে মানুষটির সফল হবার ক্ষমতা তোমার থেকেও অনেকগুণ বেশি। শুধু সঠিক সময়ে সঠিক পরিচর্যার অভাবে সে মানুষটির বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয় না। মনের দুর্বলতার প্রাচীর ভেঙে তাকে বাইরে বের হয়ে আসতে দাও। হয়তো সব সময় সবার সে সাহস এবং সুযোগ হয় না, তাই সে সফলতার প্লাটফর্মে উঠতে পারে না। সফলতার সিঁড়িতে আরোহণের জন্য এমন কিছু কাজ রয়েছে যেখানে পৌঁছতে শুধু জ্ঞান নয়, মুখ্যত ভূমিকা পালন করে তোমার ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণ।

সুতরাং যার জীবনে কোন ঝুঁকি নেই তার জীবনে সাফল্যেরও কোনো গল্প নেই। তোমার জীবনটাই হচ্ছে তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ একটি খেলার আসর। বিজয়ী হবার মনোভাব নিয়ে হয় তোমাকে ভালো খেলতে হবে, আর না হয় মাঠ ছেড়ে পালাতে হবে। তোমার স্থির দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো সুযোগ নেই। যদি জীবনকে এগিয়ে নিতে চাও তাহলে নিজের আরামদায়ক এলাকা থেকে বের হয়ে আসো। ঝুঁকি নাও এবং প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও যতক্ষণ না সফল হচ্ছো। আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো

প্রভুর সৃষ্টি

সুলতানা জাকিয়া

আদিগন্ত নজর ফেলে
দেখছি প্রভুর সৃষ্টি
কী যে দারুণ মুগ্ধ সৃজন
ভরিয়ে দিলো দৃষ্টি ।

দেখছি শ্যামল-প্রান্ত সবুজ
গাছে ফোটা ফুল
ভাবছি তোমার পৃথিবীতে
নেই তো রূপের তুল!

বিমোহিত সৃষ্টি তোমার
মুগ্ধ আমার নয়ন
তোমার সৃষ্টি থেকে করি
কাব্য-কথার চয়ন ।

আকাশ নীলে রাখলে তুমি
কী মনোহর রূপ,
রূপের সুধা পান করে রোজ
দেই তোমাতে ডুব ।

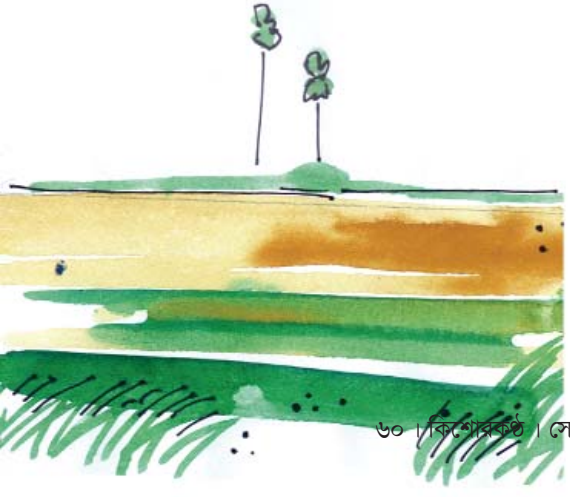

শোভন জীবন

আহমেদ রুমন

ভাঙ্গবো না আর পাখির বাসা
ধরবো না আর ছানা
ছিঁড়ব না আর ফুলগুলো সব
ধরতে ফড়িং মানা ।

ভিজবো না আর বাদল দিনে
করবো না আর ভুল
রাখবো শরীর পরিষ্কার
করবো ছোট চুল ।

নখগুলো সব করবো ছোট
মাজবো দু'বার দাঁত
খাবার আগে, খাবার পরে
ধুয়ে নেবো হাত ।

খেলার সময় খেলা
আর পড়ার সময় পড়া
নিয়ম মেনে চললে হবে
শোভন জীবন গড়া ।

অনুবাদ গল্প

জাদুকর কন্যা

জোনাকি সোরিয়ারাচ্চি
ভাষান্তর : আল ফাতাহ মামুন

সে অনেক দিন আগের কথা। এক দেশে ছিলো এক জাদুকর মহিলা। দেখতে এতই বিশ্রী ছিলো যে, মুখ দেখেই বুকে কাঁপন ধরে যেত। 'পোড়া মুখ' বলে প্রবাদটা আক্ষরিক অর্থেই সত্যি ছিলো তার বেলায়। কবে যেন কোন দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মুখখানা পুড়িয়ে আসে সে। জটবাঁধা চুল পুড়ে আরো জট লেগে যায়। চোখের পাপড়ি, কপালের ভ্রু পর্যন্ত ঝলসে যায় দৈত্যের মুখ থেকে বেরুনো আগুনের গোলার আঘাতে।

তাই বলে ভেবো না, মহিলার শক্তি কম ছিলো। বরং দৈত্যের চেয়ে ঢের বেশি শক্তি এই বিদঘুটে চেহারার মহিলার। লড়াইয়ে কম যায়নি সেও। দৈত্যের এক

হাত ভেঙে, এক পা খোঁড়া করে তবেই ছেড়েছে দৈত্যকে।

ভয়ঙ্কর এই জাদুকর মহিলার একমাত্র মেয়ে শবনম। ভারী সুন্দর নাম তাই না? কিন্তু মেয়েটি মোটেও সুন্দর ছিল না। মায়ের মতই বিদঘুটে চেহারা আর জটপাকানো চুল নিয়ে জন্মেছে। গায়ের রং দেখলে মনে হয় কে যেন আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে শরীরে। ঘৃণায় রি রি করে উঠবে তুমিও।

শবনম সবসময় চাইতো কিভাবে সুন্দর হওয়া যায়?

সারাক্ষণ মেকাপবক্স আর আয়না নিয়েই তার কাজ। সাজে আর আয়না দেখে। আয়না দেখে আর সাজে। কিন্তু সুন্দর আর হতে পারে না।

দিন যতই যাচ্ছে, নিজের বিদঘুটে চেহারা আর আলকাতরা মাখা শরীরের ওপর অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে শবনম। সারাক্ষণ এক অজানা অস্থিরতায় ছটফট করে দিন কাটে। রাতে বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে ঠিকই কিন্তু পোড়া চোখে ঘুম নামে না। চোখ বন্ধ করলেই নিজের বিদঘুটে চেহারা ভেসে ওঠে মনে। তখন যে কী পাগলামি করে মেয়েটি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করবে না তুমি। কতদিন যে জটপাকানো চুল আরো জটপাকিয়ে, কালো চেহারায় নখের আঁচড় বসিয়ে আরো লালচে কালো করে আরো ভয়ঙ্কর করে ফেলেছে তার হিসাব আমি দিতে পারব না।

অন্য দিনের মত আজো মেকাপবক্স নিয়ে আয়নার সামনে বসে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলো শবনম। শবনমের মা বলল, 'সোনা মা! আজ ভূতরাজ্যে মিটিং ডেকেছে। আমাকে সেখানে যেতে হবে।

'যাও না। তোমাকে নিষেধ করল কে আম্মু!'

আচ্ছা শেনো! চুলোয় পানি গরম বসিয়েছি। পানি ফুটলে সেদিন ধরে আনা মানুষের বাচ্চাগুলো থেকে একটা বাচ্চা ছেড়ে দিও। খুব মজা করে খাবো দু'জনে।

'ঠিক আছে মাম্মী।'

ইয়া বড় ডেকচিতে পানি গরম হচ্ছে। বড় চামচ হাতে শবনম পানি নাড়ছে। পাশেই একটি বক্সে সাত সাতটা মানুষের বাচ্চা ঝিমুচ্ছে। পানি ফুটা মাত্রই এখান থেকে একটি বাচ্চা ধরে ফ্রাই করা হবে। শবনম ও তার মায়ের প্রিয় খাবার ম্যান ফ্রাই। প্রথমে মানুষটাকে সেদ্ধ করে নেয়। তারপর মশলাপাতি মিশিয়ে তেলে ছেড়ে দেয়। কী যে স্বাদের খাবার! ওই একটা সময়ই শবনম ভুলে যায় বিশ্রী চেহারার কথা। হাম হাম করে খেয়ে প্লেট কড়াই চেটেপুটে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। তারপর লম্বা একটা ঘুম দেয়। ঘুম থেকে ওঠে আবার আয়নার সামনে দাঁড়ায়। চলতে থাকে সুন্দর হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা।

শবনম পানি নাড়ছে। এমন সময় ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। শবনমের মাথার ওপর দিয়ে একটি অনিন্দ্য সুন্দর পরী উড়ে যাচ্ছে। পরীকে দেখে শবনমের চোখ কপালে ওঠে যায়। পরী তো নয় যেন স্বর্গের অপ্সরী। এত সুন্দর পরী বা মানুষ এর আগে কখনো দেখেনি শবনম। ঠিক এমনটিই তো হতে চায় সে।

ছোট্ট শবনম দৌড়ে মায়ের ঘরে চলে যায়। বুকশেল্ফ থেকে জাদুবিদ্যার যত বই আছে সব তন্ন তন্ন করে ঘেঁটে দেখে। প্রতিটি বইয়ে চোখ বুলিয়ে যায় এক

নজর। কোথাও অনিন্দ্য সুন্দর হওয়ার রহস্য পেয়ে যেতে পারে হয়ত। কিন্তু না। আশায় গুড়ে বালি পড়ল তার। সুন্দর হওয়ার কোনো ফর্মুলাই পেল না সে।

২.

শবনমের পছন্দের খাবার রান্না হচ্ছে। তবুও ভয়াবহ রকম মন খারাপ করে বসে আছে সে। বারবার শুধু উড়ে যাওয়া পরীর ছবিটিই মনে ভেসে উঠছে তার। আর ভাবছে, কিভাবে আমি এরকম সুন্দর হতে পারব...!

একে তো মন খারাপ, তারওপর মেজাজ চড়ে আছে। এর মধ্যেই একটি বিড়াল শবনমের পায়ের কাছে এসে চুপটি করে বসল। কখনো পা ঘষে আবার কখনো মুখ ঘষে শবনমকে আদর করতে লাগল।

এটি ছিলো শবনমের আম্মুর বিড়াল। শবনম বিড়ালটিকে একদমই সহ্য করতে পারত না। সে বিড়ালটিকে বারবার তাড়িয়ে দেয়। বিড়ালটি আবার আসে। পায়ের কাছে বসে শবনমকে আদর করে।

এবার আর ধৈর্য রাখতে পারেনি শবনম। বিড়ালটির লেজ ধরে শূন্যে ঘুরাতে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর প্রচণ্ড জোরে ছুড়ে মারে। এত জোরে ছুড়ে মারে যে, বিড়ালটি একদিকে পড়ে আর লেজ পড়ে আরেক দিকে।

মিয়াও! মিয়াও! বলে কাঁদতে কাঁদতে লেজহীন বিড়ালটি চলে যায়।

শবনম ফিরেও তাকায় না।

বিড়ালের লেজ খসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটল এক আশ্চর্য কাণ্ড। শবনমের পেছনে গজিয়ে যায় ইয়া বড় একটি লেজ। প্রচণ্ড রেগে থাকার কারণে গজানো লেজ সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারেনি শবনম।

এবার একটি কাক শবনমকে জ্বালাতন করতে শুরু করে। আসলে জ্বালাতন করার কোন ইচ্ছেই ছিলো না কাকটির। কাকটি ছিলো শবনমদের পোষা কাক। শবনমের পেছনে ইয়া বড় লেজ দেখে কাকটা খুব ঘাবড়ে যায়। সে ভাবে এটা বোধ হয় কোন সাপ হবে। শবনমকে কামড়াতে এসেছে। কাকটি লেজকে সাপ ভেবে ঠুকরে ঠুকরে তাড়িয়ে দিতে চাইছে।

এ দিকে শবনমের অবস্থা তো বুঝতেই পারছ। বেচারি এমনিতেই রেগে মেগে আগুন হয়ে আছে। এর ওপর যদি পেছন থেকে কেউ দড়ি লাগিয়ে টানাটানি করে তাহলে কেমন লাগবে বলো তো? কিন্তু শবনমের পেছনে যে ইয়া বড় লেজ গজিয়েছে বোকা মেয়েটি তখনো বুঝতে পারেনি। বুঝবে কিভাবে? রাগের মাথায় কী কারো কোনো হুঁশ থাকে বলো?

পেছনে ঘুরে হাতের চামচ দিয়ে খুব জোরে কাকের মাথায় আঘাত করল শবনম। বেচারি কাক উপকার করতে এসে যেন বলির পাঁঠা হলো। চামচের গায়ে লেগে থাকা গরম পানি পড়ে চামড়া ঝলসে গেছে কাকের। পশম উপড়ে গেছে শরীর থেকে। কা কা কা কা বলতে বলতে চলে গেল কাকটি। এদিকে রাগি শবনমের বারোটা বেজে তেরোটা হয়ে গেছে। সুন্দর হওয়ার চিন্তায় সারাক্ষণ ডুবে থাকা মেয়েটির গা ভর্তি লোম গজিয়ে উঠেছে। কী যে বিশ্রী দেখাচ্ছিলো বলে বোঝাতে পারব না তোমাদের। কিন্তু তখনো শবনম বুঝে উঠতে পারেনি ঠিক কী হচ্ছে তার সঙ্গে।

এমন সময় শবনমদের ছাগলটি এসে শবনমের শরীর জিহবা দিয়ে চাটতে শুরু করল। ছাগল বোঝাতে চাচ্ছে, ও শবনম! আমার খুব মাম খেতে ইচ্ছে করছে। আমায় একটু মাম দেবে? নিরীহ ছাগলটিই রাগি শবনমের পরবর্তী শিকার হলো। পানির বদলে পেল কষে এক লাথি। লাথি খেয়ে গড়াতে গড়াতে পড়ল অনেক দূরে গিয়ে। ভয়ে আর ব্যথায় ছাগলটির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আর শবনমের মুখে গজিয়ে উঠেছে ছাগলের মত দাড়ি। মাথার সব চুল কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সেখানে এখন খড়ের বোঝা দেখা যাচ্ছে। মুখে দাড়ি আর মাথায় খড়ের মত চুল ওঠায় শবনমকে একদম জোকার জোকার লাগছিল।

শবনমের মাথায় খড় দেখে গরু মামা তো বেজায় খুশি। আয়েশ করে খড় খাওয়া যাবে- এই ভেবে আনন্দে লাফাতে লাফাতে গরু আসছে শবনমের দিকে। শবনম ভাবছে, গরুটা আবার এদিকে কেন আসছে? নিশ্চয় তাকে বিরক্ত করতে।

গরুটাকে কোনোভাবেই কাছে ঘেঁষতে দেওয়া যাবে না। যেই ভাবা সেই কাজ। চুলোর ভেতর থেকে একটি পোড়া কাঠ নিয়ে ছুড়ে মারল গরুর দিকে। কাঠ গিয়ে লাগল গরুর শিং বরাবর। গরু মামাতো ভয়ে পড়িমড়ি করে কোনরকম ছুটে বাঁচল।

কিন্তু শিং দুটো আর আস্ত রইল না। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। শিং গেছে তো কী হয়েছে, বেঁচে তো ফিরেছি- স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গরু মামা।

এ দিকে গরু মামার শিং ভেঙেছে। আর ওদিকে শিং গজিয়েছে রাগি শবনমের মাথায়।

শবনমের বিশ্রী হওয়ার ষোলকলা পূর্ণ করল পোষা কুকুর এসে। কিম্ভূতকিমাকার শবনমকে দেখে কুকুর ভাবল, এই অদ্ভুত প্রাণীটা আবার কে? ঘেউ ঘেউ করে ঘুরতে লাগলো শবনমের চারপাশে। শবনম তো রাগে ক্ষোভে যেন ফেটে পড়তে চাইছে। বড় ঢাকনাটি একহাতে তুলে আরেক হাতে কুকুরের মাথা শক্ত করে ধরে দ্রিম দ্রিম মারতে শুরু করল। মার খেয়ে বেচারা কুকুরের গেল দাঁত ভেঙে।

সঙ্গে সঙ্গে শবনমেরও দাঁতগুলো গেলো পড়ে।

৩.

পুরো ব্যাপারটা দূর থেকে দেখছিলো শবনমের পোষা টিয়া পাখি। শবনমের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে আর চুপ থাকতে পারেনি সে। টিয়া জানত, এখন কিছু বললেই অন্য সবার মত তারও বারোটা বেজে যাবে। তাই একটু কৌশলে শবনমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে। হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিলো।

এবার শবনম নিজেই টিয়া পাখির কাছে এসে বলল, কী হয়েছে তোর? এভাবে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদছিস কেনো? পাখিটি আরো জোরে জোরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ও শবনম! প্রিয় শবনম আমার! তোমাকে এবার সত্যি সত্যি খুব বিশ্রী দেখাচ্ছে। প্লিজ! একবার আয়নায় নিজেকে দেখো!

এতক্ষণ পর্যন্ত যা ঘটল, শবনম কিছুই বুঝতে পারেনি। আয়নায় নিজেকে দেখার পর তো ভয়ে চমকে ওঠে সে। নিজেকে দেখে নিজেই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার

অবস্থা। 'ওহ নো' বলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শবনম।

একটু পর সে শুনতে পায় আকাশ পথে কে যেন উড়ে যাচ্ছে। সেই পরীটি নয়ত? দৌড়ে বাইরে আসে। হ্যাঁ! ওই পরীটিই। যার মত সুন্দর হতে চেয়ে এখন এই দশা হয়েছে তার। এবার আর শবনম নিজেকে মানাতে পারেনি। পরীটির দিকে হাত পা ছুড়ে পাগলের মত বকতে শুরু করে। চিৎকার করে বলতে থাকে, তোমার জন্য! তোমার জন্যই আজ আমার এ দশা হয়েছে। তুমি কেনো আমাকে দেখা দিলে? আমি তোমার মত সুন্দর হতে চেয়েছিলাম। এখন আমার এই পরিস্থিতির দায়ভার তোমাকেই নিতে হবে। তুমি অবশ্যই আমাকে বলবে সুন্দর হওয়ার গোপন রহস্য কী...?

শান্ত মাথায় শবনমের সব অভিযোগ শুনল পরীটি। এসবের একটিও যে সঠিক এবং যৌক্তিক নয় পরীটি জানে। তারপরও সে শবনমের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে খুব আফসোস করল। খুব মায়া হলো বোকা শবনমের জন্য। মিষ্টি করে বলল, প্রিয় বন্ধু আমার! তুমি কি সত্যি সুন্দর হতে চাও? ঠিক আমার মতোই?

অবশ্যই চাই। বলল শবনম।

তাহলে মন দিয়ে শোনো, সুন্দর হওয়ার গোপন রহস্য। তুমি যদি অন্যকে ভালোবাসো, হৃদয় উজাড় করে তাদের সেবা করো, সুন্দর আর ভালো ভালো কাজ করো- তাহলেই তুমি সুন্দর হয়ে উঠবে। একটু আগেই কতগুলো দুর্বল প্রাণীর সঙ্গে তুমি খুব খারাপ ব্যবহার করছিলে। কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের ফল তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছো। এখনো তোমার চোখে-মুখে-শরীরে তার ফল জ্বল জ্বল করছে। কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে আসলে নিজেকেই অসুন্দর আর বিশ্রী করা হয়। আমরা অনেকেই বিষয়টি বুঝতে পারি না। তোমাকে অবশ্যই অন্যদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে যদি তুমি নিজেকে সুন্দর দেখাতে চাও।

খুব মনোযোগের সঙ্গে কথাগুলো শুনল শবনম। চোখে-মুখে এক ধরনের অনুতপ্তের ছাপ ফুটে উঠেছে। ব্যাকুল সুরে সে জিজ্ঞস করল, তাহলে এখন আমি কী করব বন্ধু?

একটু আগে তুমি যাদের কষ্ট দিয়েছো তাদের কাছে ফিরে যাও। মন থেকে তাদেরকে স্যরি বলো। সেবা করে তাদের দুঃখ ভুলিয়ে দাও। তাদের সঙ্গে মিষ্টি স্বরে কথা বলো। তাহলে দেখবে তোমার এই কর্কশ ভয়েস খুব মিষ্টি হয়ে গেছে। শুনতে বেশ লাগছে।

শবনম এক মুহূর্তও দেরি করে না। ছুটে যায় বিড়াল কাক ছাগল গরু আর

কুকুরের কাছে। সবাইকে কাছে বসিয়ে নিজ হাতে তাদের ক্ষতে ওষুধ লাগিয়ে দেয়। এত নির্দয়ভাবে আঘাত করার জন্য বারবার স্যরি বলে ওদেরকে। শবনমের আন্তরিক ব্যবহার আর মিষ্টি কথা শুনে সবার মন আনন্দে ভরে ওঠে। সবার মুখে সুখের হাসি ফোটে।

শবনম যখন ওদের সেবা করছিলো, তখন আস্তে আস্তে সে সুন্দর হতে শুরু করে। মাথার শিং পড়ে যায়। খড়ের মত চুলের জায়গায় গজিয়ে ওঠে দীঘল কালো চুল। দাড়ি পড়ে গিয়ে মুখ হয়ে ওঠে আরো সুন্দর। আরো চমৎকার। শরীর থেকে ঝরে পড়ে বিদঘুটে লোমগুলো। সবকিছু মিলিয়ে শবনম হয়ে ওঠে সত্যিকারের পরী। পরীদের মতই পেছনে দুটি ডানা গজায় শবনমের। এতদিনে শবনম সত্যিকারের সুন্দর হতে পেরেছে। পেরেছে আসল পরী হতে।

তারপর থেকে সে আর কখনো কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। কাউকে কষ্ট দেয় না।

জোনাকি সোরিয়ারাচ্চি। শ্রীলংকার জনপ্রিয় এই শিশুসাহিত্যিক মাত্র ৮ বছর বয়স থেকে লেখালেখি শুরু করেন। ১৪ বছর বয়সে তার প্রথম বই 'অ্যা ব্যালেড' প্রকাশ হয়। এখন পর্যন্ত তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২ শ' ছাড়িয়েছে। বাঙ্কা অ্যাওয়ার্ড ২০০৫ (জাপান), স্ট্যাট লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড ২০০৪ (সিংহলি) এবং স্ট্যাট লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড ২০০৭ (ইংরেজি) ছাড়াও লেখালেখির স্বীকৃতি স্বরূপ আরো অনেক পুরস্কার তিনি অর্জন করেন। 'দ্য ওয়েচ ডটার' বা 'জাদুকরকন্যা' তার অন্যতম সেরা গল্প।

কিশোরকণ্ঠের গ্রাহক হতে চাও?

সর্বাধিক প্রচারিত শিশুকিশোর মাসিক পত্রিকা কিশোরকণ্ঠ পৌঁছে যাবে তোমার নিকটস্থ পোস্ট অফিসে।

তোমার ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দাও আমাদের ইনবক্সে

তুমি যা লিখে পাঠাবে-

নাম, পিতার নাম, গ্রাম, পোস্ট অফিস, পোস্টকোড, থানা, জেলা, মোবাইল নম্বর এবং তুমি কত কপি পত্রিকা নিবে।

ইমেইলেও তোমার ঠিকানা পাঠাতে পারো।
E-mail: kishorkantha@yahoo.com

http://www.facebook.com/kishorkanthabd

ভোরে আসি

মুহিব্বুল্লাহ ফুয়াদ

ভোরের আকাশ হালকা বাতাস
মিষ্টি লাগে ভারি
পাখির সুরে হারাই দূরে
মন নিয়ে যায় কাড়ি।

গাছের শাখা সবুজ পাতা
হাওয়ায় হেলে দুলে
ঘুম ভাঙে ওই পাখির ছানার
ক্লান্ত মায়ের কোলে।

জল টলমল ঘাসের ডগায়
ফুলের মুখে হাসি
আঁকাবাঁকা পথের ছবি
দেখতে ভোরে আসি।

চাঁদটা বসে খোঁজে

মাহমুদ হায়াত

একটা শিশু আকাশ চেয়ে
পাতলো দুটো হাত,
আকাশ কি আর সাধ্যিকথা
হাঁড়ির পান্তাভাত?

আকাশ তাকে দিতেই হবে
চাঁদটা না-হয় পেড়ে,
নইলে সে যে ঘুম যাবে না
উঠবে দু'হাত ছেড়ে।

শিশুর এমন কাণ্ড দেখে
মায়ের চোখে ধোঁয়া,
চাঁদটা কি আর সাধ্যিকথা
হাত বাড়ালে-ছোঁয়া?

কিন্তু মায়ের মনে কি আর
ওসব কথা বোঝে?
রাত দুপুরে হাত বাড়িয়ে
চাঁদটা বসে খোঁজে।

ইউরোপের উন্নত দেশ
ইতালি

মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

ইতালি আল্পস পর্বতমালার মাধ্যমে সীমানা নির্দেশিত এবং বেশ কয়েকটি দ্বীপ পরিবেষ্টিত একটি উপদ্বীপ নিয়ে গঠিত রাষ্ট্র। সরকারিভাবে দেশটিকে ইতালিয়ান প্রজাতন্ত্র বলা হয়। ইতালিয়ান ভাষায় ইতালিকে বলা হয় ইতালিয়া। ইতালির মোট ভূমির শতকরা ৩৫ ভাগ পর্বত দ্বারা গঠিত। ইতালি দক্ষিণ-মধ্য ইউরোপে অবস্থিত হলেও এটাকে পশ্চিম ইউরোপের অংশ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। এটি একটি একীভূত প্রজাতান্ত্রিক সংসদীয় রাষ্ট্র। এর রাজধানী রোম।

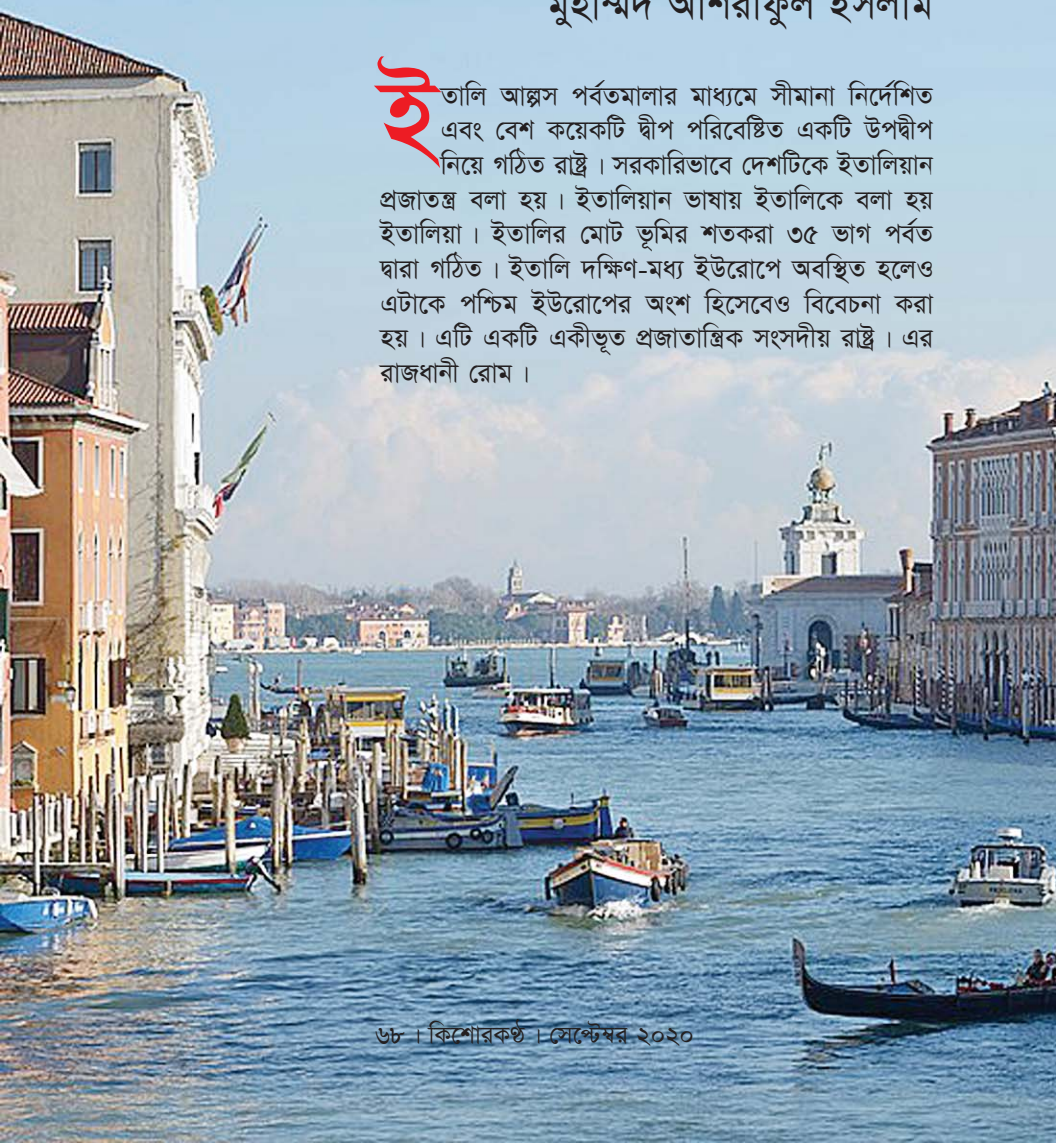

ইতালির উত্তর সীমান্তে আল্পস্ পর্বতমালা সংলগ্ন ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও স্লোভেনিয়া অবস্থিত এবং দক্ষিণে সম্পূর্ণ ইতালীয় উপদ্বীপ, মেডিটারিয়ান সমুদ্র সংলগ্ন দুই মহাদ্বীপ সিসিলি ও সারদিনিয়া এবং আরো অনেক ছোট ছোট দ্বীপে পরিবেষ্টিত। সান মারিনো ও ভ্যাটিক্যান সিটি নামের দুটি স্বাধীন ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ইতালির অভ্যন্তরে অবস্থিত, অপরদিকে কাম্পিওনে ও লামপেডুসা নামে ইতালির দুটি অঞ্চল যথাক্রমে সুইজারল্যান্ড ও তিউনিশিয়ার সমুদ্রসীমার মধ্যে অবস্থিত। ঋতুময় ইতালির আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ।

১১৭টি দ্বীপে নির্মিত
ভেনিস নগরী

ইতালির পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ

ইতালির আয়তন প্রায় ৩ লাখ ১ হাজার ৩৪০ বর্গকিলোমিটার (১ লাখ ১৬ হাজার ৩৫০ বর্গমাইল)। জনসংখ্যা ৬ কোটি ৩ লাখ ১৭ হাজার ১১৬ জন। জাতিগত গ্রুপের মধ্যে রয়েছে ইতালীয় ৯১.৫ শতাংশ এবং অন্যান্য ৮.৫ শতাংশ। প্রধান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রয়েছে খ্রিষ্টান ৮৩.৮ শতাংশ, অধার্মিক ১২.৪ শতাংশ, মুসলিম ৩.৭ শতাংশ, বৌদ্ধ ০.২ শতাংশ, হিন্দু ০.১ শতাংশ এবং অন্যান্য ০.৩ শতাংশ। ইতালি জনসংখ্যার দিক দিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নে তৃতীয় এবং বিশ্বে ২৩তম জনবহুল দেশ।

এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত একটি দেশ। শেনঝেন চুক্তি স্বাক্ষরকারী বিধায় শেনঝেন ভিসা নিয়ে এ দেশে প্রবেশ করা যায়। ইউরো অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বিধায় এর মুদ্রা ইউরো। এ দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু আছে।

দক্ষিণ ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কেন্দ্রীয় ভৌগোলিক অবস্থানের দরুন ইতালি ঐতিহাসিকভাবে অসংখ্য জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির আবাসস্থল। বর্তমান আধুনিক ইতালিতে এই বিভিন্ন প্রাচীন জনগোষ্ঠী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছাড়াও এখানে ইন্ডো-ইউরোপীয় ইতালিক জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য রয়েছে। এরাই এই উপদ্বীপের নামকরণ করে। সেই প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ফিনিশিয়ান ও কার্থেজিয়ানরা বহুলাংশে পানিবেষ্টিত ইতালিতে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে, গ্রিকরা দক্ষিণ ইতালির তথাকথিত ম্যাগনা গ্রায়েশিয়ায় বসতি প্রতিষ্ঠা করে এবং ইট্রাস্কান ও সেল্টরা যথাক্রমে মধ্য ও উত্তর ইতালিতে বসবাস করতো। ল্যাটিন্স

ইতালির উচ্চগতিসম্পন্ন ট্রেন। এর গতি ঘণ্টায় ৪০০ কিলোমিটার

নামে পরিচিত একটি ইতালিক গোত্র খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে রোমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, যা পরবর্তীতে সিনেট ও জনগণের একটি সরকারসহ প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। রোমান প্রজাতন্ত্র প্রাথমিকভাবে ইতালীয় উপদ্বীপে তার প্রতিবেশীদের দখল ও অঙ্গীভূত করে, পরবর্তীকালে ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু অংশ জয় করে সম্প্রসারিত হয়। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যে রোমান সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকায় প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং একটি শীর্ষস্থানীয় সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়। আর এর ফলে প্যাক্স রোমানিয়ার সূচনা ঘটে। প্যাক্স রোমানিয়ার ২০০ বছরেরও বেশি সময়কালে ইতালির আইন, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, শিল্পকলা ও সাহিত্যের উন্নয়ন ঘটে। ইতালি রোমানদের মাতৃভূমি এবং সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়ে আছে। সংস্কৃতি, সরকারব্যবস্থা, খ্রিষ্টধর্ম এবং ল্যাটিন লিপির বিশ্বব্যাপী বিস্তারে রোমান সাম্রাজ্যের স্বাক্ষর এখনো লক্ষ করা যায়।

মধ্য যুগের গোড়ার দিকে ইতালি পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং বারবারদের আগ্রাসন দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে, তবে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বিশেষ করে ইতালির উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র ও সামুদ্রিক প্রজাতন্ত্রগুলো ব্যবসা, বাণিজ্য ও ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জন করে। আর এভাবে আধুনিক পুঁজিবাদের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। বহুলাংশে স্বাধীন এসব ক্ষুদ্ররাষ্ট্র এশিয়া ও নিকট প্রাচ্যের সাথে ইউরোপের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র

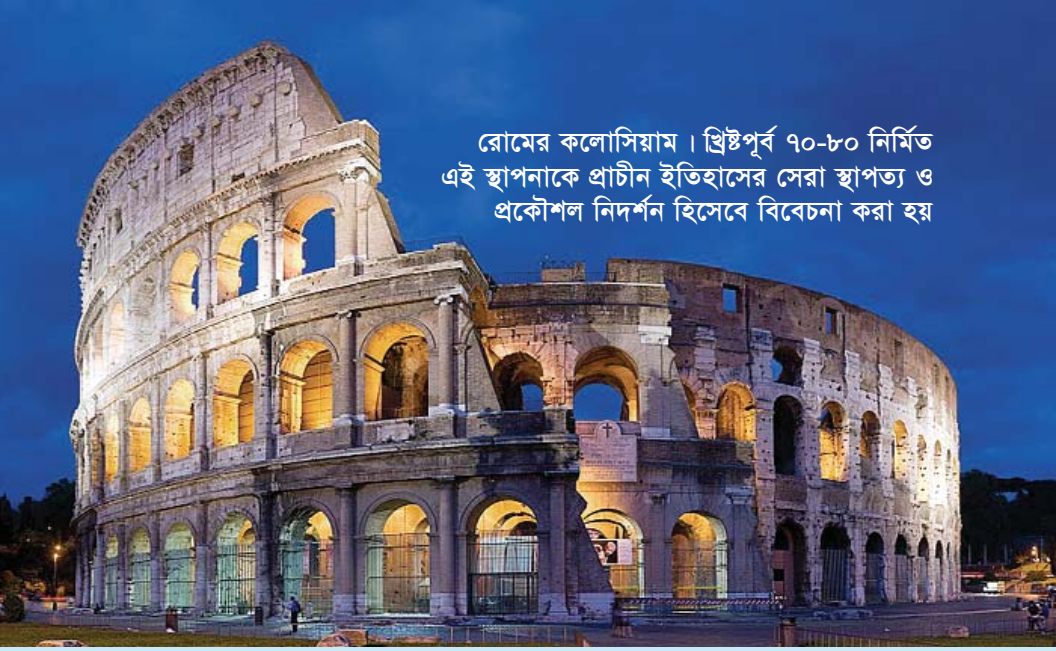

রোমের কলোসিয়াম। খ্রিষ্টপূর্ব ৭০-৮০ নির্মিত এই স্থাপনাকে প্রাচীন ইতিহাসের সেরা স্থাপত্য ও প্রকৌশল নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়

হিসেবে কাজ করে। এরা প্রায়শই বৃহত্তর সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলোর তুলনায় অনেক বেশি গণতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। অপরদিকে বৃহত্তর সামন্ত রাজ্যগুলো সারা ইউরোপে তাদের অবস্থান সংহত করতে থাকে। কিন্তু মধ্য ইতালির একাংশ ঈশ্বরতান্ত্রিক প্যাপাল স্টেটস বা ধর্মরাজ্য হিসেবে রয়ে যায়। অপরদিকে, দক্ষিণ ইতালি ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বহুলাংশে সামন্ত রাজ্য হিসেবেই থেকে যায়। আংশিকভাবে বাইজান্টাইন, আরব, নরমান, অ্যাংজেভিন, অ্যারাগোনিজ এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য বিদেশী পরম্পরাগত বিজয়ের ফলে ইতালিতে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়। ইতালিতে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ শুরু হয় এবং তা অবশিষ্ট ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। আর এর ফলে গোটা ইউরোপে নতুন করে মানবতাবাদ, বিজ্ঞান, আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সমুদ্র ভ্রমণ ও শিল্পকলায় আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ইতালীয় সংস্কৃতি বিকশিত হয় এবং বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গ, শিল্পীগণ এবং বহুবিদ্যাবিশারদদের আবির্ভাব ঘটে। ইতালীয় অনুসন্ধানীরা দূর প্রাচ্য ও নতুন বিশ্বেও পথ আবিষ্কার করে, যা ইউরোপীয় আবিষ্কার যুগের উন্মেষ ঘটাতে সহায়ক হয়। তথাপি, ভূমধ্যসাগর এড়িয়ে বাণিজ্যপথ খুলে গেলে ইতালির বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পায়। ইতালীয় নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বহু শতাব্দীর দ্বন্দ্ব এবং অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের (যেমন পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় যুদ্ধ) ফলে ইতালি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে থাকে এবং বহু শতাব্দী ধরে নানা ইউরোপীয় শক্তি ইতালিকে আরো বিভক্ত করে।

মধ্য-ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ইতালীয় জাতীয়তাবাদী জাগরণ এবং বিদেশী নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীনতার দাবি

বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। কয়েক শতাব্দীর বৈদেশিক শাসন এবং রাজনৈতিক বিভক্তির পর ইতালি ১৮৬১ সালে প্রায় পুরোপুরি একীভূত হয়ে যায় এবং একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে ইতালি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইতালি বিশেষ করে উত্তরে দ্রুত শিল্পায়িত হয়ে ওঠে এবং একটি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য অর্জন করে; পক্ষান্তরে দক্ষিণ অংশ বহুলাংশে অনুন্নত থেকে যায় এবং শিল্পায়ন থেকে বাদ পড়ে। ফলে একটি বৃহৎ ও প্রভাবশালী প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চারটি প্রধান মিত্র শক্তির অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও ইতালি অর্থনৈতিক সঙ্কট ও সামাজিক গোলযোগের মধ্যে পড়ে। এর ফলে ১৯২২ সালে ইতালীয় ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের উত্থান ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষ শক্তির পক্ষে অংশগ্রহণের পরিণতি দাঁড়ায় সামরিক পরাজয়, অর্থনৈতিক ধ্বংস এবং ইতালীয় গৃহযুদ্ধ।

ইতালীয় খাবার : (ঘড়ির কাঁটার অনুরূপ) পিজা, পাস্তা, এসপ্রেসো ও গেলাটো

ইতালির তুসকানির চিয়ান্তি এলাকার আঙ্গুর ক্ষেত। ইতালি বিশ্বের বৃহত্তম আঙ্গুর উৎপাদক দেশ

ইতালির স্বাধীনতার পর দেশটি রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভোগ করে এবং একটি অতি উন্নত দেশে পরিণত হয়।

বর্তমানে, ইতালি সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। দেশটি বিশ্বের অষ্টম-বৃহত্তম অর্থনীতি, জাতীয় সম্পদের দিক দিয়ে ষষ্ঠ-বৃহত্তম এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বর্ণ মজুদের দিক দিয়ে তৃতীয়-বৃহত্তম। মানুষের গড় আয়ু, জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এদেশের অবস্থান অনেক উচ্চে। ইতালি আঞ্চলিক ও বিশ্ব অর্থনীতি, সামরিক, সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশটি আঞ্চলিকও একটি বৃহৎ শক্তি। ইতালি ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতৃস্থানীয় সদস্য এবং অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য, যেমন জাতিসংঘ, ন্যাটো, ওইসিডি, ওএসসিই, ডব্লিউটিও, জি৭, জি২০, ভূমধ্যসাগরীয় ইউনিয়ন, ইউরোপীয় কাউন্সিল, ইউনাইটিং ফর কনসেনসাস, শেনজেন এরিয়া ও অন্যান্য বহু সংস্থা। ইতালিতে বিশ্বের বৃহত্তম সংখ্যক বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান রয়েছে এবং পর্যটন আকর্ষণের দিক দিয়ে দেশটির অবস্থান বিশ্বে পঞ্চম।

শতাব্দীর পশ্চিমা সভ্যতায় রোমান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল হওয়ার কারণে রোমকে ইতালির রাজধানী করা হয়। এর অবনতির পর, ইতালি বহুসংখ্যক ভিনদেশী, জার্মানিক উপজাতি যেমন লোম্বার্ডস ও ওস্ট্রুগোথস থেকে শুরু করে বাইজান্টাইন্স এবং পরবর্তীতে নর্মান্স, সাথে আরো অনেকের অনুপ্রবেশ সহ্য করেছে। পরবর্তী শতাব্দী রেনেসাঁর জন্মভূমি হয়ে উঠে। ইতালির অখণ্ড আকারের পরবর্তীকালীন ইউরোপীয় বুদ্ধিদীপ্ত গতিবিধি ও চিন্তা ধারণা ব্যাপকভাবে উর্বরতা পায়।

রোমানোত্তর ইতিহাসে যদিও ইতালি অনেক রাজ্য ও শহরে বিভক্ত ছিলো- সারদিনিয়া রাজ্য, দুই সিসিলিয়া রাজ্য, ডাচি অব মিলান কিন্তু ১৮৬১ সালে একীভূত হয়, ইতিহাসের এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে, যা "ইল রিসরজিমেন্ত" (পুনরুত্থান) নামে পরিচিত। ১৯ শতকের শেষের দিকে, ১ম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ২য় বিশ্বযুদ্ধকালীন ইতালি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এর শাসন লিবিয়া, ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, আলবেনিয়া, ডোডেকানিস পর্যন্ত বর্ধিত করে ও চীনের তিয়াঞ্জিন শহরও এতে সম্মতি প্রদান করে।

বর্তমান ইতালি একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এদেশের পার্লামেন্ট দ্বিকক্ষবিশিষ্ট : উচ্চকক্ষ সিনেট এবং নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ (চেম্বার অব ডেপুটিজ)। বর্তমান প্রেসিডেন্ট সারজিও মাত্তারেলা, প্রধানমন্ত্রী জিউসেপ্পে কন্তে। ইতালির প্রশাসনিক এলাকা ২০টি অঞ্চল, ১০৭টি প্রদেশ বা মেট্রোপলিটান নগরী এবং ৭ হাজার ৯৬০টি পৌরসভায় বিভক্ত। ইতালিকে

পো নদীর বদ্বীপে উড়ন্ত ফ্লামিংগো পাখি

বিশ্বের ২৩তম উন্নত দেশ হিসেবে গণ্য করা হয় ও জীবনের মান নির্দেশ বিচারে বিশ্বের সেরা দশে এদেশের অবস্থান। ইতালির ইউরোপীয় ও পৃথিবীব্যাপী সামরিক, সাংস্কৃতিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্কে বিশাল ভূমিকা পালন করে। ইউরোপীয় রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব দেশটিকে দিয়েছে আঞ্চলিক শক্তির মর্যাদা। দেশটির রয়েছে সরকারি উচ্চশিক্ষা কাঠামো ও উচ্চ বিশ্বায়িত জাতি।

ইতালি ইউরেশীয় প্লেট ও আফ্রিকান প্লেটের মিলনস্থলে অবস্থিত। ফলে এদেশে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত ঘটে থাকে। ইতালিতে ১৪টি আগ্নেয়গিরি আছে। এগুলোর মধ্যে ৪টি সক্রিয়। সেগুলো হলো ইতনা, স্ট্রমবলি, ভালকানো ও ভেসুভিয়াস।

ইতালির আবহাওয়া খুবই বৈচিত্র্যময়। অভ্যন্তরীণ উত্তর ও মধ্য অঞ্চলের বেশির ভাগে আর্দ্র আধা-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় থেকে আর্দ্র মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় আবহাওয়া বিরাজ করে। বিশেষ করে, পো উপত্যকা ভৌগোলিক অঞ্চলের আবহাওয়া বহুলাংশে মহাদেশীয়, অর্থাৎ কঠিন শীতকাল এবং উত্তপ্ত গ্রীষ্মকাল। উপকূলীয় লিগুরিয়া ও তুসকানি এলাকা এবং দক্ষিণের অধিকাংশ এলাকায় সাধারণত ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়া বিরাজ করে। উপদ্বীপীয় উপকূল এলাকার অবস্থা অভ্যন্তর ভাগের উচ্চতর ভূমি থেকে একেবারেই ভিন্ন। বিশেষ করে, শীতকালীন মাসগুলোতে উঁচু পর্বতগুলোতে আবহাওয়া ঠাণ্ডা, ভেজা ও তুসারময়। উপকূলীয় অঞ্চলে মৃদু শীতকাল এবং উষ্ণ ও শুষ্ক গ্রীষ্মকাল।

সাদা সারস

শিমন রহমান

বাঁশ বাগানের মাথার ওপর
সাদা সারস থাকে,
সন্ধ্যে হলে আপন মনে
গলা তুলে ডাকে।

ভোর বেলাতে উড়ে উড়ে
যায় রে বিলের ধারে,
পোহাতে হয় সময় অনেক
ধরতে পুঁটি তারে।

চুপটি করে ঘুপটি মেরে
থাকে বসে ঠাঁই,
আগের মত পায় না যে আর
ছোট্ট পুঁটি নাই।

হরিণ শাবক ও ইলিশের বন্ধুত্ব

শ্যামলী বিনতে আমজাদ

বনের ভেতর যেই নদীটা সাপের মত চলে
সেই নদীটার একটা ইলিশ বড্ড কথা বলে,
নরম বায়ুর বন্ধু হতে হরিণ শাবক রোজ
গা ঘেঁষানো সবুজ ক্ষেতে ঘাস করতো ভোজ।
হঠাৎ করেই বাচাল ইলিশ হরিণছাকে ডেকে
বলে আমার বন্ধু হবি? দেবোই ছবি এঁকে।
কোমল মনে হরিণ ছানা হয়ে গেল রাজি,
ঠিক কিছুদিন পরেই হল, তাদের মাঝে বাজি।
হরিণ ইলিশ ডাঙ্গা জলে খেলবে যে দৌড় খেলা
যে ফার্স্ট হবে সে নেবে খুব দামি পুঁতির মালা
নিয়ম মেনে বন্ধু দুজন নামলো খেলায় ঠিকই
প্রতিবারই ইলিশ প্রথম, থাকলো হরিণ ফিকই
গর্বে ইলিশ বসলো চেয়ে, ওগো হরিণ ভাই
আমার কিন্তু সবচে দামি ঐ মালাটাই চাই।
হরিণ ছানা পায় না ভেবে সবচে দামি কী
করতে হবে পূরণ তাকে বন্ধুর আশা টি
হঠাৎ সেদিন বনের ভেতর দুই শিকারি আসে
বন হরিণের মাংস নিয়ে স্বাদের গল্পে ভাসে।
এমন কথা শুনে হরিণ যায় পালিয়ে দূরে
মোটকা গাছের গর্তে বসে কাঁদে করুণ সুরে
অবশেষে হরিণ ছানার ঘটলো ভাবার ইতি
সবচে দামি মাংস নিজের, ভাবলে আসে ভীতি!
বন্ধু ইলিশ তোমার জন্য হচ্ছে রেডি মালা
তৈরি থেকো সকাল সকাল মন করে উজালা
যথাসময় নদীর তীরে হরিণ চাকু হাতে
নিজের মাংস কেটে কেটে সুতা দিয়ে গাঁথে
বিশ্বজয়ের মালা পরে, ইলিশ গেল ছুটে
রক্তমাখা হরিণ শাবক পড়লো জলে লুটে।

পাখি পাকা পেঁপে খায়

জুয়েল আশরাফ

পাখি বিশারদ পাখাল ভাইকে ঘিরে আমাদের আড্ডা চলছিল স্কুল মাঠের ভেতর। রোজ বিকেলে এই স্কুল মাঠটাই আমাদের প্রাণের আনন্দের প্রধান উৎস। পাখাল ভাই তার ভুলভাল বিভিন্ন তথ্য দিয়ে রোজ আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করেন। আমরা তার চালাকি সবই বুঝি। মুখে কিছু বলি না। শুধু শুনে যাই। পাখাল ভাই আমাদের সিনিয়র পারসন। তার ভুল ধরলে লজ্জিত হবেন। বড়ো ভাইদের লজ্জিত করা উচিত হবে না ভেবে চুপ করে থাকি। কিন্তু আজ রকি নীরব থাকতে পারল না। পাখাল ভাই পাখির খাদ্য সম্পর্কে বিশাল বক্তৃতা দিচ্ছিলেন- 'পাখিই একমাত্র জীব যা সরাসরি মানুষের উপকার করে থাকে। বুঝলি?'

আমরা সবাই একত্রে হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে বলি- 'বুঝলাম।'

'পাখির ডাক শুনতে না পেলে একটা ভোর কখনো স্নিগ্ধ হয় না। অথচ সেই পাখির খাবার নিয়ে আমরা কখনো চিন্তা করি না! তোরা চিন্তা করেছিস?'

'না, চিন্তা করিনি।' সবাই বলি।

আমরা চিন্তা করিনি বলেই বোধ হয় পাখাল ভাই আরাম পেলেন। বিজ্ঞ আর সবজান্তার ভঙ্গিতে বললেন, 'পাখি পাকা ফল খাওয়ার সময় বীজসহ খায়, পরে পায়খানার সঙ্গে বীজ বের হয়ে যায়, সেখান থেকে জন্ম নেয় নতুন গাছ...।'

রকি বিরক্ত হয়ে বলল, 'ছিঃ পাখাল ভাই, পায়খানা না বলে বিষ্ঠা বলেন, বিষ্ঠা। এরকম বিচ্ছিরি শব্দ ব্যবহার করলে এই জেনারেশন আপনার কাছে কী শিখবে?'

পাখাল ভাই নিজের শব্দ ব্যবহারে সতর্ক হয়ে বললেন, 'আমরা দেখে থাকি আমাদের বাড়ির আঙ্গিনায়, উঠোনে, ঝোপঝাড়ে, জঙ্গলময় জায়গায় নতুন অনেক গাছ, যেগুলো কারো লাগানো নয়। ফুলের পরাগায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে পাখি। তবে সবচেয়ে গুরুত্ববহ কাজ হলো কীটপতঙ্গ নিধন। তোদের কাছে কি পরাগায়ন আর নিধন শব্দ দুটি কঠিন মনে হচ্ছে? আমি আবার সহজ শব্দ ব্যবহার করতে পারি না। তোরা তো স্কুলের ছেলেপুলে সব, অবশ্য তোদের কাছে এই শব্দ না বোঝারই কথা।'

ভাষা বিশারদের মতো ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে পাখাল ভাই একটু থামলেন। সেই সুযোগে রকি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল, 'আমরা সবাই এখন বড়ো হয়েছি। এখন আর প্রাইমারি স্কুলে পড়ি না, হাইস্কুলে পড়ি।'

পাখাল ভাই বললেন, 'ফসলের অসংখ্য ক্ষতিকারক পোকা পাখি খেয়ে ফেলে। ফলে ফসল প্রাকৃতিকভাবে রক্ষা পায়। শূন্যে উড়ে উড়ে পাখি উড়ন্ত পোকা খায়। পরিসংখ্যান বলে, ছোট একটি পাখি এক ঘণ্টায় বারোশো পোকা খেয়ে ফেলতে পারে।'

'তেরোশো পোকা নয় কেন? অথবা এগারোশো?' রকি বলল।

এবার সত্যি সত্যি রকির ওপর আমার রাগ পেয়ে গেল। গুরুত্বপূর্ণ কথার মাঝে একটু পরপরই সে বাধা সৃষ্টি করছে। মানলাম আমরা ছোট মানুষ, তাই পাখাল ভাই উল্টোপাল্টা তথ্য বলে আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু আজ তিনি যেসব বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, আমার মনে হয় না এসব কোনো ভুল তথ্য। আমার ছোট কাকু রোজ পত্রিকা পড়েন, ইতিহাস পড়েন, তার ঘরভর্তি বই। সেদিন কাকুর ঘরে এসে দেখলাম, পাখিবিষয়ক একটা ছোট্ট আর্টিকেল কাকু মন দিয়ে পড়ছেন। আমিও কাকুর সঙ্গে একটু পড়লাম। জানা গেল পাখি সম্পর্কে অজানা অনেক তথ্য। আমার তাই মনে হচ্ছে পাখাল ভাই আজ আমাদের সঠিক কিছু শুনিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু রকিটা খুব জ্বালাতন করে যাচ্ছে।

আমি পাখাল ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বিনয়ের সুরে বলি, 'পাখাল ভাই, আপনি বলতে থাকেন। আমরা মন দিয়ে শুনছি।'

খেয়াল করলাম, বিরক্ত মুখে পাখাল ভাই রকির দিকে তাকিয়ে আছেন। রকি আরেকবার জ্বালালে ঠাস করে গালে চড় বসিয়ে দিতে পারেন। আমার ভদ্র

আচরণ পেয়ে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এনে বলতে শুরু করলেন, 'চীন দেশের একটি ঘটনা শোন সবাই। চীনা গবেষকদের প্রতিবেদনে উঠে আসে, একটি চড়ুই পাখি বছরে চার থেকে পাঁচ কেজি শস্য খেতে পারে। সে হিসাবে দশ লাখ চড়ুইয়ের খাবার বাঁচিয়ে প্রায় ষাট হাজার মানুষের খাদ্যের জোগান দেওয়া যেতে পারে। এ প্রতিবেদন চীনাদের ভাবনায় ফেলে দিল। কৃষির ক্ষতির কথা ভেবে অসংখ্য চড়ুই পাখি হত্যা করা হয়। চড়ুই মারার জন্য জোরেশোরে লোকদের বলা হলো। চড়ুই মারার উৎসবে মেতে উঠল গোটা চীন দেশ। দেশের আর্মিও চড়ুই হত্যার কাজে লেগে গেল। চড়ুই হত্যার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করা হলো। লোকজন বিভিন্ন পদ্ধতিতে চড়ুই মারতে থাকল। ডিম ও বাসা নষ্ট করা হলো। জালে আটকা পড়ল অসংখ্য চড়ুই। বন্দুক দিয়ে গুলি করে মারা হলো বাকি চড়ুই পাখি। চীন দেশের সব চড়ুই মারা পড়ল...'

রকি আফসোসের সুরে বলল, 'ইশ্! এই চড়ুইগুলি যদি আমাদের দেশে থাকতো! তেলে ভাজা করে খেতাম।'

'পরের বছরগুলোতে ফসলে স্বাধীনভাবে হানা দিল ক্ষতিকর অজস্র পোকা। সেই পোকা দমনের জন্যে পাখি তো নেই! পরিস্থিতি এমন হলো, সেই ফসল আর ঘরে তোলা গেল না। চীনে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। মারা গেল অসংখ্য লোক। টনক নড়ল দেশটির সরকারের। প্রকৃতিতে চড়ুই ফিরিয়ে আনতে শুরু হলো চড়ুই আমদানি।'

'কয়টি চড়ুই আমদানি হয়েছিল? আচ্ছা শুধু কি চড়ুই পাখি পোকা মারার কাজ জানে? অন্য পাখি কি ঘোড়ার ঘাস কাটে শুধু?' রকি প্রশ্ন করে।

জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দিয়ে পাখাল ভাইকে বেশ আরাম পেতে দেখলাম। দীর্ঘসময় পাখিবিষয়ক বক্তৃতায় চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ নেই, বরং উৎসাহিত আর আনন্দিত

পাখাল ভাই রকির কথা শুনেও না শোনার ভান করে বললেন, 'এখন বুঝলি তোরা পরিবেশ রক্ষায় মানুষের চেয়ে পাখির ভূমিকা বেশি? পাখি আমাদের পরম বন্ধু। আমাদের আশপাশে আছে অনেক রকমের ফলের গাছ। ফল পাখির ভালো খাবার। অসংখ্য ফলগাছ পাখির ফেলে যাওয়া বীজ থেকে হয়েছে। এ জন্য গাছের ফলে রয়েছে পাখিরও অধিকার। পাখির জন্য গাছে কিছু ফল রাখা উচিত। তাহলে পাখি এইসব ফল খেয়ে আবার সেই গাছের বিস্তার ঘটাবে, উপকার হবে মানুষেরই।'

জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দিয়ে পাখাল ভাইকে বেশ আরাম পেতে দেখলাম। দীর্ঘসময় পাখিবিষয়ক বক্তৃতায় চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ নেই, বরং উৎসাহিত আর আনন্দিত। যেন পাখিবিষয়ক যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেই, সাথে সাথেই জবাব দেবে আমাদের পাখাল

ভাই। অবশ্য আমরা প্রশ্ন করি না। চুপ মেরে থাকি। আমাদের এত বুদ্ধি নেই প্রশ্ন করব।

রকি বলল, "আচ্ছা পাখাল ভাই, আপনি তো পাখি সম্পর্কে অনেক জেনে গেছেন। 'পাখি পাকা পেঁপে খায়'-এই কথাটা দ্রুত কতবার বলতে পারবেন?"

পাখাল ভাই এবার বিরক্ত হলেন। বললেন, 'তুই আমার সাথে বাঁদরামি করিস? সহজ কথাটা বলতে না পারার কী আছে?'

'আচ্ছা বলুন। শুনব আপনার মুখ থেকে।' রকি চ্যালেঞ্জের গলায় বলল।

পাখাল ভাই বড়ো করে শ্বাস নিলেন। এরপর বললেন, 'পাখি পাকা পেঁপে খায়, পাখি পাকা পেঁপে খায়, পাখি পাপা পেঁপে খায়, পাখি পাপা পেকে খায়, পাখি পাপা পেকে খায়...।'

খিল খিল করে হেসে ফেলল রকি। সঙ্গে আমরাও হেসে উঠি। 'পাখি পাকা পেঁপে খায়' দ্রুত বলতে গিয়ে পাখাল ভাই বলে ফেলেছেন-'পাখি পাপা পেঁপে খায়'। আরেকবার বললেন, 'পাখি পাপা পেকে খায়'।

রকি বলল, 'পাখিদের নিয়ে আপনি এত জানেন, আর এই সামান্য কথাটা ঠিকমতো বলতে পারলেন না! আগে শুদ্ধ বাংলা শিখে আসেন, তারপর পাখিবিষয়ক আমাদের জ্ঞান দেবেন।'

রকির কথা শেষ হতেই, আরেক দফায় হাসতে হাসতে আমরা সবাই ঘাসের ওপর গড়িয়ে যাচ্ছি। অপমান সহ্য করতে না পেরে, পাখাল ভাই রাগে দুঃখে উঠে দাঁড়ালেন। যেতে যেতে বললেন, 'তোদের মতোন বাঁদরদের সাথে থাকলে আমিও বাঁদর হয়ে যাব!'

টুনটুনি

আরিফুল ইসলাম সাকিব

ছোটো পাখি টুনটুনি
এনে দেবো ঝুনঝুনি
আয় কাছে আয়,
নীলিমার নীল দিয়ে
রঙধনু রঙ নিয়ে
দেবো তোর গায়।

এই বসে এই ছোটে
খড়কুটা নিয়ে ঠোঁটে
উড়ে উড়ে যায়,
নেই কোনো আহাজারি
ছোটো ঘর ছোটো বাড়ি
খুঁটে দানা খায়।

খোকাবাবু বলে মাকে
ছোটো ঐ পাখিটাকে
চাই কাছে চাই,
ভালোবাসা দিয়ে ওকে
রাখবো যে চোখে চোখে
যদি কাছে পাই।

বেন স্টোকস
সেরা অলরাউন্ডার

আবু আবদুল্লাহ

কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালের কথা। শেষ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়ের জন্য দরকার ১৯ রান। ইংলিশ অধিনায়ক বল তুলে দিলেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার বেন স্টোকসের হাতে। আগে দুই ওভার মোটামুটি ভালোই বোলিং করেছেন স্টোকস। তা ছাড়া শেষ ওভারে স্ট্রাইকিং প্রান্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৮ নম্বরে ব্যাট করতে নামা বোলার কার্লোস ব্রাথওয়েট। ম্যাচ তাই পুরোপুরিই ইংল্যান্ডের দিকে হেলে আছে; কিন্তু ভাগ্য সেদিন হেলে ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের দিকেই। তাই তো স্টোকসের চার বলে পরপর চারটি ছক্কা হাঁকিয়ে অসাধ্য সাধন করেন ব্রাথওয়েট। চ্যাম্পিয়ন হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভিলেনে পরিণত হন বেন স্টোকস।

এই ঘটনার ঠিক ৩ বছর ৩ মাস ১১ দিন পর ইংল্যান্ড আরেকটি বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলতে নামে লর্ডসে। সেটি ছিলো ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপের

ফাইনাল। প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। এবারো ইংল্যান্ডের ভাগ্য গড়ে দেওয়ার দায়িত্ব পড়ে বেন স্টোকসের কাঁধে। এবার ব্যাট হাতে অপরাজিত ৮৪ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলেন তিনি। ২৪২ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ইংল্যান্ডও তোলে নিউজিল্যান্ডের সমান ২৪১ রান। পিছিয়ে থাকা ইংল্যান্ডকে শেষ ওভারে দুটি ছক্কা হাঁকিয়ে টেনে তোলেন স্টোকস। ম্যাচ টাই হলে নিষ্পত্তির জন্য খেলা হয় সুপার ওভার। সেখানেও ইংল্যান্ডের হয়ে ব্যাট করতে নামেন স্টোকস। নাটকীয় সেই ম্যাচে সুপার ওভারেও টাই হয়। উভয় দলই করে ১৫ রান করে। শেষ পর্যন্ত পুরো ম্যাচে বাউন্ডারি সংখ্যা বেশি হওয়ায় ইংল্যান্ড জেতে বিশ্বকাপ। সুপার ওভারেও ইংল্যান্ডের ১৫ রান তোলায় বড় ভূমিকা ছিলো স্টোকসের। অবশ্য ভাগ্যেরও কিছুটা সহায়তা ছিলো।

সে যাই হোক- ক্রিকেটের জন্মদাতা ইংল্যান্ড প্রথমবারের মতো জেতে বিশ্বকাপ ট্রফি। ম্যাচ সেরা হন বেন স্টোকস। ইংল্যান্ডবাসীর কাছে নায়ক হয়ে ওঠেন তরুণ বেন স্টোকস। এখানে একটি বিষয় মনে করিয়ে দেই, স্টোকস বিশ্বকাপ ফাইনালে যাদের বিরুদ্ধে এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে ইংল্যান্ডকে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছেন, সেই নিউজিল্যান্ডই কিন্তু তার জন্মভূমি। ১৯৯১ সালে নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে জন্ম তার। পুরো নাম বেনজামিন এন্ড্রু স্টোকস। তার বাবা ছিলেন নিউজিল্যান্ড জাতীয় দলের রাগবি খেলোয়াড়। স্টোকসের বয়স যখন ১২ বছর, সে সময় তার পরিবার ইংল্যান্ডে অভিবাসী

আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে অলরাউন্ডারদের মধ্যে এক নম্বরে আছেন

হয়। শৈশবে বাবার কাছে রাগবি শিখলেও পরবর্তীতে ক্রিকেটকেই বেছে নেন স্টোকস। বাম হাতে ব্যাটিং করার পাশাপাশি ডান হাতে মিডিয়াম পেস বোলিংয়ে শৈশব থেকেই দক্ষতার পরিচয় দেন তিনি।

যার ফলে ২০০৯ সালে কাউন্টি দল ডারহামের হয়ে পেশাদার ক্রিকেটে অভিষেক স্টোকসের। সেদিন বল করতে গিয়ে ব্যক্তিগত তৃতীয় বলেই উইকেট নেন স্টোকস। ওই বছরই ডাক পান ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ দলে। যুব বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে করেন দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি। এরপর কাউন্টি ক্রিকেটেও ডারহামের হয়ে দারুণ খেলতে থাকেন। ২০১১ সালের আগস্টে ইংল্যান্ডের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন পূরণ হয়। অভিষেক হয় আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে ম্যাচ দিয়ে। আর টেস্ট দলে ডাক পান ২০১৩-১৪ অ্যাশেজ সিরিজ দিয়ে। সেই সিরিজেই করেন ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি।

তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম কয়েকটা বছর ভালো কাটেনি স্টোকসের। দলে আসা-যাওয়ার মধ্যেই ছিলেন। সেই সাথে জন্মও দিয়েছিলেন বেশ কিছু বিতর্কিত ঘটনার। তবে সে সব পিছনে ফেলে ২০১৭ সালটা ছিলো তার ক্যারিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। ওই বছর দেশের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুটি সেঞ্চুরি করেন অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ২৯৯ রান ও ৭ উইকেট নেন। কয়েক দিন পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ছিলেন আরো দুর্দান্ত। দুটি সেঞ্চুরির

পাশাপাশি নেন ২ উইকেট। ওই বছর আইসিসির বর্ষসেরা টেস্ট ও ওয়ানডে দলে জায়গা করে নেন এই অলরাউন্ডার।

ওই বছরই আইপিএলে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হয়ে হইচই ফেলে দেন ক্রিকেট বিশ্বে। ১৭ লাখ ইউরোতে (১৬ কোটি ৭২ লাখ টাকা) নিলাম থেকে তাকে কিনে নেয় রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্ট। পরের বছরও তার দাম ওঠে ১৪ লাখ ইউরো। এরপর ক্রমশই বিশ্ব ক্রিকেটে নিজের অবস্থান শক্ত করেছেন স্টোকস। জ্যাক ক্যালিস ও আবদুর রাজ্জাকের পর বিশ্ব ক্রিকেটে অনেক দিন প্রতিভাবান পেস বোলিং

আইসিসি ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে আছেন দ্বিতীয় অবস্থানে

অলরাউন্ডারের যে অভাব ছিলো তার দূর হয়েছে তার কল্যাণে। আর ইংল্যান্ড পেয়েছে ইয়ান বোথাম, এন্ড্রু ফ্লিনটফের যোগ্য উত্তরসূরি।

২০১৯ বিশ্বকাপে বিশ্ব দেখেছে বেন স্টোকসের সত্যিকারের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। উদ্বোধনী ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ব্যাট হাতে ৮৯ রানের ইনিংস খেলার পাশাপাশি নিয়েছেন ২ উইকেট। সেই ম্যাচে তার নেয়া আন্দিল ফেহলুকওয়ের ক্যাচটি সর্বকালের সেরা ক্যাচগুলোর একটি। এরপর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অপরাজিত ৮২ এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে করেন ৮৯ রান। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি ছিলো ইংল্যান্ডের বাঁচা-মরার লড়াই। জিতলে বেঁচে থাকবে সেমিফাইনালে যাওয়ার আশা, না জিততে পারলে বিদায় নিতে হবে টুর্নামেন্ট থেকে। সেই ম্যাচে ৫৪ বলে ৭৯ রানের ইনিংস খেলেন

স্টোকস। আর ফাইনালে কী করেছেন সে কথা তো লেখার শুরুতেই বলেছি।

ইংল্যান্ডকে বিশ্বকাপ এনে দেওয়ার কিছুদিন পরই দেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অ্যাশেজ সিরিজ খেলতে নামেন স্টোকস। সিরিজে ইংল্যান্ডের হয়ে দুই সেঞ্চুরিসহ ৪৪১ রান ও ৮ উইকেট নেন। তবে সেই সিরিজে হেডিংলিতে অতিমানবীয় এক ইনিংস খেলেন স্টোকস। নিশ্চিত পরাজয়ের দুয়ার থেকে ইংল্যান্ডকে জয় এনে দেন অপরাজিত ১৩৫ রানের ইনিংস খেলে। ২-২ এ সিরিজ ড্র করে ইংল্যান্ড। স্টোকসের সেই ইনিংসটি সর্বকালের সেরা টেস্ট ইনিংসের তালিকায় স্থান পেয়ে গেছে। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৬৭ রানে অলআউট হয়ে যাওয়ার পরও ইংল্যান্ড জিতেছিল ম্যাচটি। প্রথম ইনিংসে ৭০ রানের কম করেও টেস্ট জেতার সর্বশেষ ঘটনা ছিলো ১৩১ বছর আগে। সেই স্মৃতিই ফিরিয়ে আনলেন স্টোকস। চতুর্থ ইনিংসে ৩৫৯ রান তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ডের নবম উইকেট পড়ে যায় ২৮৬ রানে। জয়ের জন্য তখনো দরকার ৭৩ রান। তার মধ্যে শেষ ব্যাটসম্যান জ্যাক লিচ করেছেন মাত্র ১ রান। আসলে পুরোটা সময় স্ট্রাইক ধরে রেখে যেভাবে ম্যাচ শেষ করেছেন স্টোকস, সেটিই তার ইনিংসটিকে নিয়ে গেছে সর্বকালের সেরা ইনিংসের কাতারে। প্রথম চার বলে চার-ছক্কা কিংবা দুই রান ছাড়া নেননি। পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ বলে সিঙ্গেল নিয়ে প্রান্ত বদল করে পরের ওভারে আবার স্ট্রাইক নিয়েছেন।

অনবদ্য এসব পারফরম্যান্সের

২৯ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার হয়তো আরো অনেক দিন সমৃদ্ধ করবেন ক্রিকেটকে

কারণে আইসিসির ২০১৯ সালের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন বেন স্টোকস। একই বছর বিবিসির বিচারে বছরের সেরা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়া ক্রিকেটের বাইবেল খ্যাত উইজডেন ক্রিকেট ম্যাগাজিনের 'ক্রিকেটার অব দ্য ইয়ার' মনোনীত হয়েছেন।

২০২০ সালের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও জাত চিনিয়েছেন স্টোকস। চার টেস্টের সিরিজে ৩১৮ রান করার পাশাপাশি নিয়েছেন ১০ উইকেট। এরপর করোনাভাইরাসের সংক্রমণে চার মাস বন্ধ থাকার পর ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে যখন ক্রিকেট মাঠে ফিরেছে তখনও বেন স্টোকস বুঝিয়ে দিয়েছেন এই চার মাসে এতটুকু ধুলাও জমেনি তার প্রতিভায়। সাউদাম্পটনে সিরিজের প্রথম টেস্টেই ১৫০ উইকেট ও ৪ হাজার রান করার

অনেকেই স্টোকসকে সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডার বলতে শুরু করেছেন

মাইলফলক স্পর্শ করেন। আর ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডে দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে ১৭৬ রান করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে করেন অপরাজিত ৭৮ রান। ৬৫ টেস্টের ক্যারিয়ারের দশম সেঞ্চুরি ছিল সেটি। বল হাতে নিয়েছেন ৩ উইকেট। তার এই অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের কারণেই প্রথম টেস্ট হেরে গিয়েও সিরিজে সমতায় ফেরে ইংল্যান্ড।

একের পর এক কীর্তির কারণে অনেকেই বেন স্টোকসে সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডার বলতে শুরু করেছেন। তবে সেটি না হলেও তিনি এই সময়ের সেরা অলরাউন্ডার সেটি বলতে আর কারো দ্বিধা থাকার কথা নয়। আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে অলরাউন্ডারদের মধ্যে এক নম্বরে আছেন। আর ওয়ানডেতে আছেন দ্বিতীয় অবস্থানে। ৬৫ টেস্ট পর্যন্ত ৩৯ গড়ে তার রান ৪৩৯৯, সেঞ্চুরি ১০টি। আর বল হাতে উইকেট ১৫৬টি। ৯৫ ওয়ানডেতে ৪১ গড়ে রান ২৬৮২, সেঞ্চুরি ৩টি, উইকেট নিয়েছেন ৭০টি। ২৬টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলে ৩০৫ রানের পাশাপাশি উইকেট ১৪টি। বর্তমানে ২৯ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার হয়তো আরো অনেক দিন ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করবেন পারফরম্যান্স দিয়ে। সেই সাথে নিজেকে নিয়ে যাবেন নতুন উচ্চতায়।

খোকার মান ভঞ্জন

জগবন্ধু রায়

এই খোকা, দ্যাখ দেখি
থাল খেলো কুকুরে,
চুপ করে কেন্ আছো
ভরা রোদ দুপুরে?

চট্ করে খেয়ে নাও
এক-গ্রাসে সবটুকু
ঐ দেখো চাঁদ মামা
এই দেখো, লাল খুকু।

রাগ উঠে সেকি জেদ
পারি নাই সামলাতে
দুধ কলা বাসি হয়
এক সিকি গামলাতে!

ঝপ্ করে, দেই ফেলে
ঐ পচা পুকুরে,
কাক এসে খেয়ে যাক্
বাকি খাক্ কুকুরে।

হুট করে ডেকে কয়
ভাত আনো এক মুঠো
খেয়ে আজ ভরি পেট
চেখে দেই আর দুটো।

ভালো মেয়ে

ঝুমা আক্তার

এক দুই তিন চার
বই পড়ে কবিতার।
পাঁচ ছয় সাত আট
ভালোবাসে ছড়া পাঠ।

ছড়া আর কবিতায়
মন গাঁথে নবিতায়।
ছড়া পাঠে এক নং
ছবি এঁকে করে রং।

নবিতায় সব পারে
আলসেমি করে নারে।
এই মেয়ে ভালো খুব
লেখাপড়ায় দেয় ডুব।

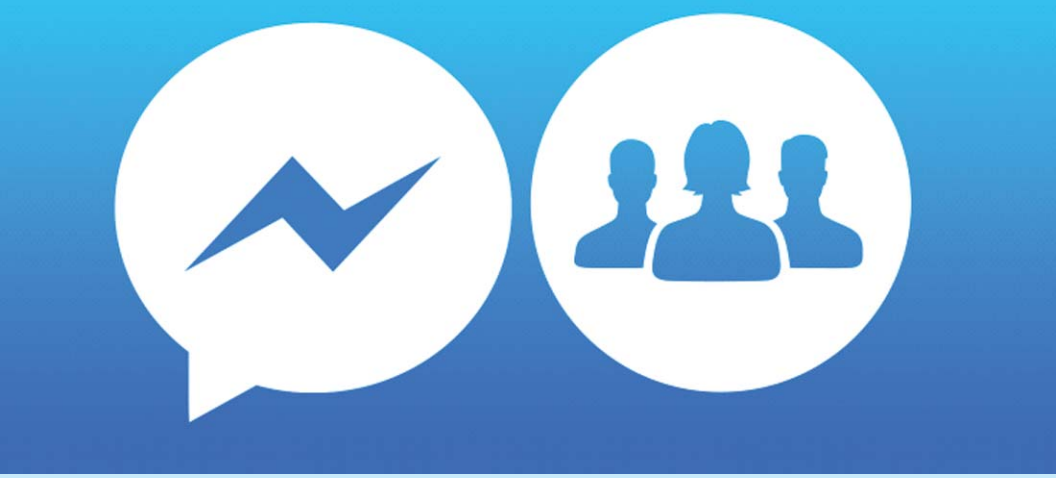

ফেসবুক রুম
লাইভ ব্রডকাস্টিং ফিচার

শরীফ তাজওয়ার

ফেসবুক লাইভ প্রোগ্রাম আধুনিক বিশ্বের এক প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ এখন। করোনাকালে সেটা আরও জনপ্রিয় হয়েছে। বলা যায় এটা ছাড়া এখন প্রোগ্রাম করার অন্য কোনো ভালো ব্যবস্থা নেই। তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে একই লাইভে থাকার নিজস্ব কোনো ব্যবস্থাপনা ছিল না ফেসবুকের। অন্য একটা ব্রডকাস্টিং মিডিয়ার সহযোগিতায় সমন্বয় করতে হতো। তবে এবার সব ফেসবুক ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত হলো ফেসবুক রুম। এই রুম ফিচারের মাধ্যমে কোন সময়সীমা ছাড়াই ৫০ জন পর্যন্ত একসাথে ভিডিও কনফারেন্স করতে পারবেন। ফেসবুকের যোগ করা নতুন এই ফিচার অনেকটা লাইভ ভিডিও সম্প্রচারের মতো। যার কনফারেন্স মেসেঞ্জার জুমের অনুকরণে তৈরি করা।

এই ফিচারের মাধ্যমে কেউ ফেসবুক ব্যবহার না করলেও ইনভাইট লিঙ্ক ব্যবহার করে ওয়েব পেইজের মাধ্যমে মেসেঞ্জার রুমের ভিডিও কলিংয়ে যোগ দিতে পারবে। করোনাভাইরাসের মহামারীতে পুরো বিশ্ব লকডাউনে যাওয়ায় ভিডিও কনফারেন্স চাহিদা বাড়ে। ব্যাপকভাবে ভিডিও কলিং ফিচার ব্যবহার করছে মানুষ। সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে ফেসবুকের এই "রুম" ফিচার। অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারীরা গুগলের প্লে স্টোর থেকে মেসেঞ্জার অ্যাপটি আপডেট করে নিয়ে এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবে। শুধু অ্যান্ড্রয়েডই নয়, উইন্ডোজ, আইওএস বা

ম্যাকওএস ব্যবহারকারীরাও ভিডিও কনফারেন্সিং ফিচার ব্যবহার করতে পারবে। এ জন্য সব ব্যবহারকারীকে তাদের মেসেঞ্জার অ্যাপটি আপডেট করতে হবে।

ফেসবুকের সম্প্রতি উন্মুক্ত করা ভিডিও কনফারেন্সিং টুল মেসেঞ্জার রুমসে যুক্ত হয়েছে লাইভ ব্রডকাস্টিং ফিচার। এ ফিচার ব্যবহার করে ব্যবহারকারী ৫০ অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে চালানো ভিডিও কল লাইভ স্ট্রিমিং বা সরাসরি সম্প্রচার করতে পারবে। এতে ফেসবুক লাইভ সুবিধাটি যুক্ত করা যাবে। ফেসবুক এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছে, মেসেঞ্জার রুমস ও ফেসবুক লাইভ একত্রে এনে নতুন পদ্ধতিতে পরস্পরকে যুক্ত করার ও তারা দূরে থাকলেও কনটেন্ট তৈরি করার সুবিধা আনা হচ্ছে। ফিচারটি বেশ কয়েকটি দেশে ফেসবুক ও মেসেঞ্জার ওয়েবে পাওয়া যাবে। যেসব দেশে মেসেঞ্জার রুমস সেবাটি চালু করা হয়েছে, সেখানে শিগগিরই মেসেঞ্জার মোবাইল ও মেসেঞ্জার ডেস্কটপ অ্যাপে পাওয়া যাবে।

রুমস সৃষ্টিকারী তাঁর রুমসের কার্যক্রম প্রোফাইল, পেজ বা গ্রুপে সম্প্রচার করতে পারবে। চাইলে মানুষকে আমন্ত্রণ জানাতেও পারবে। লাইভ ব্রডকাস্ট নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে রুমস সৃষ্টিকারী। এ ছাড়া ব্রডকাস্টিংয়ে অংশগ্রহণকারীকে যুক্ত করা বা বাদ দেওয়ার ক্ষমতাও রুমস সৃষ্টিকারীর হাতে থাকবে। সরাসরি সম্প্রচারের সময় রুমস লক বা আনলক করাও যাবে। লাইভ ব্রডকাস্টের সময় রুমসে অংশগ্রহণে একটি নোটিফিকেশন পাবে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা। তবে এতে যুক্ত হবে কি না, তা ঠিক করতে পারবে সে। চাইলে যেকোনো সময় লাইভ না দেখে চলে যেতেও পারবে। যখন রুমস সৃষ্টিকারী লাইভ শুরু করবে, তখন সম্প্রচার ফেসবুকে চলতে থাকবে এবং রুমসের বাইরে থাকা লোকজন রুমসে কী হচ্ছে তা দেখতে পাবে।

তোমাদের গল্প

বিনোদন

জান্নাতা নিঝুম শিল্পী

পিঠাপিঠি দুইভাই মিঠু জিঠু। বাঁদরামিতে মিঠু জিঠু এপাড়ার সেরা হলেও, ওরা কোন অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দেয় না। প্রতিবাদ জানাবেই! ওরা দু'জনেই খুব সাহসী ছেলে। আজ পুকুরপাড়ে ডালিম গাছটার নিচে মিঠু ঠ্যাংয়ে ঠ্যাং তুলে বসে হাই তুলছে।

এমন সময় জিঠু এসে বলল,

কী ব্যাপার মিঠুভাই তুমি এখানে বসে আছো যে? ওদিকে কত কাজ বাকি!

- তো কী করব বল? সকাল সকাল তো মাথা খারাপ করে দিয়েছে, ঐ শুঁটকিটা!

শুঁটকি হলো মিঠুদের পাড়ার চিকু, দেখতে খুব চিকনা! তাই মিঠু ওকে শুঁটকি বলে ডাকে।

- কেন? কী করেছে ও?

- কী আবার করবে আমার মাথা খেয়েছে! আমার কাছে এসে এই সকালে ঘ্যান ঘ্যান শুরু করেছে। আজ বিকেলে তোমাদের সাথে ইকো পার্কে নিয়ে যাবে। আমার মাকে যেন বলবে না।

আচ্ছা! তুই বল জিঠু, ওর মাকে যদি না বলে ঐ শুঁটকিকে নিয়ে যাই পার্কে বেড়াতে, তাহলে খবর করে দেবে ওর মা!

এমনিতেই তো ওকে না খাইয়ে না খাইয়ে শুঁটকি বানিয়েছেন, আবার এখন যদি না বলে ঘুরতে নিয়ে যাই, তাহলে তো হাঁড়ির ভাত ওর জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

জিঠু বলল, আচ্ছা! মিঠুভাই চিকুর মা এমন কেন বলতো? আমাদের মা তো এমন নয়। আমাদের পড়ার সময় পড়ার সুযোগ দেয়, খেলার সময় খেলায়। মা বলে, এই বয়সে আমাদের একটু বিনোদনের প্রয়োজন আছে। খেলাধুলা

করার দরকার আছে। এতেও আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আর চিকুটাকে কোন সময় ওর মা বেরুতেই দেয় না বাসা থেকে।

মিঠু বলল, আমাদের মা খুব ভালো। কিন্তু শুঁটকির মা এগুলো বোঝেই না, মনে করেন ঘরের মধ্যে ঘরকুনো হয়ে টেবিলে বসে থাকলেই ওর পড়াশোনা ভালো হবে। কিন্তু তা নয়।

চিকু পড়াশোনায় একদম কাঁচা। ঘরে বন্দী থেকে কেউ কখনোও পাকা হয়নি বুঝলি জিঠু!

হ্যাঁ মিঠুভাই বুঝলাম। চলো ব্যাপারটা মার সাথে শেয়ার করতে হবে। তাহলে আমরা চিকুর সমস্যাটা সল্‌ভ করতে পারব।

- হ্যাঁ চল,

দুপুরে হাত মুখ ধুয়ে, মায়ের কাছে খেতে বসল মিঠু জিঠু, আলু-বেগুন ভর্তা, পোনা মাছ আর ডাল দিয়ে ভাত খাচ্ছে ওরা।

খেতে খেতে জিঠু বলে উঠল, আজকের রান্নাটা কিন্তু হেব্বি হয়েছে মা।

মা হেসে বলল, তাই নাকি! রোজই ভালো হয়। কোন দিন খারাপ হয় বল দেখি!

মিঠু বলল, মা আজ বিকেলে আমরা পার্কে বেড়াতে যাব, চিকুও যেতে চায়, কিন্তু ওর মা যেতে দেবে না।

- বলিস কী মিঠু? কেন যেতে দেবে না?

হ্যাঁ মা সত্যি বলছি!

চিকু আমাদের সাথে রোজ মাঠে যেটুকু খেলে তাও লুকিয়ে লুকিয়ে। ওর মাকে খুব ভয় পায় চিকু।

- আচ্ছা ব্যাপারটা আমাকে ছেড়ে দে।

খাওয়া শেষে মিঠু জিঠু হাত ধুয়ে ইয়ে...এএ, বলে চিৎকার করে উঠল।

মিঠু জিঠুর মা এলেন চিকুদের বাড়ি, পিছু পিছু ওরা দুজনেও এলো।

চিকুর মা মিঠুর মাকে দেখে বলে উঠল, কেমন আছেন আপা? এতোদিন পর আমাদের বাড়িতে পা পড়ল? মিঠুর মা হেসে বলল, সংসারের কাজে খুব ব্যস্ত থাকি আপা, ছেলেদের সামলাতে হয়। সব মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি।

বসেন আপা বসেন, চেয়ার এগিয়ে দিলেন চিকুর মা।

তা চিকু কোথায়? ওকে তো দেখছি না?

আর বইলেন না আপা! ছেলেটা যা বেয়াড়া হয়েছে একটুও পড়ে না, খায় না, সব সময় ফাজলামি করে। এখন ঘরের মধ্যে বসে আছে।

মিঠুর মা চিকুকে ডাকলেন, মিঠু জিঠুও আসল।

চিকুর মাকে মিঠুর মা বললেন, আপা ছেলেকে সব সময় ঘরে বন্দী করে রাখলে, ওর মন ভালো থাকবে না। ও একঘেয়ে হয়ে পড়বে। পড়াশোনার ক্ষতি হবে।

আপনি ওকে বাইরের সবুজ ছোঁয়া, প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দিন, প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস নিতে দিন। ওর স্বাস্থ্য ও মন ভালো হয়ে উঠবে।

চিকুর মা লজ্জা পেয়ে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন আপা। মিঠু জিঠুর মতো চিকুকে যদি আমি খোলামেলা রাখতাম তাহলে ও পড়াশোনায় ভালো হতো। আজ থেকে চিকুও মিঠু জিঠুর সাথে খেলবে।

ওরা তিনজনে ইয়াহু চিৎকার দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, ইকো পার্কের দিকে।

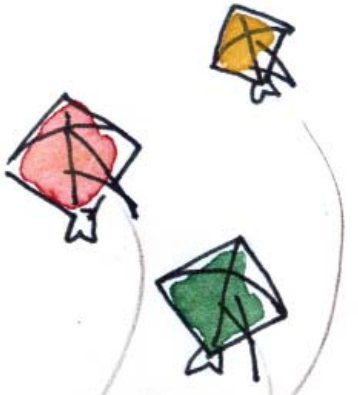

ইচ্ছা করে

শফিকুল আলম

ইচ্ছা করে চাঁদ হয়ে যাই ছড়াই রাতে আলো
আঁধার টুটে বঙ্গদেশে মানুষ করি ভালো ।
ইচ্ছা করে তারা হয়ে মিটিমিটি জ্বলি,
বাগবাগিচায় ফুলে ফুলে ফুটাই প্রেমের কলি ।

ইচ্ছা করে নদ হয়ে যাই সাঁতার কাটুক মাছে,
জলের স্রোতে দুঃখ ভাসুক থাকুক আপন কাছে ।
ইচ্ছা করে বাগ হয়ে যাই বাসা বাঁধুক পাখি
কুহুকুহু কলতানে খুলুক শিশু আঁখি ।

ইচ্ছা করে মেঘ হয়ে যাই গায়ে মাখি ছায়া,
ভালোবাসার আদর দিয়ে রাখুক মনে মায়া ।
ইচ্ছা করে কাব্য হয়ে সবার কথা লেখি
মানুষজনের কী হয়েছে? স্বচক্ষে তা দেখি ।

ইচ্ছা করে দেশ হয়ে যাই থাকুক সবাই বুকে
মানবতায় প্রাণটা দিয়ে থাকি সুখে-দুঃখে ।
ইচ্ছা করে আকাশ হয়ে বক্ষে রাখি রবি
সকাল সন্ধ্যায় মিলেমিশে তুলি দারুণ ছবি ।

ঘুড়ি

আল আমিন মোহ

মেঘ ছুঁই ছুঁই ইচ্ছে মনে
উড়ছে দেখো ঘুড়ি,
চাঁদের দেশে ঘুমিয়ে এখন
চরকা কাটা বুড়ি ।

করোনাকাল ছুটি বহাল
বই-খাতা তাই ফেলে,
নাটাই হাতে ঘুড়ি উড়ায়
পাড়ার সকল ছেলে ।

আকাশপানে চেয়ে থাকে
দস্যিপনার দল সব,
আজ আকাশে নানা ঘুড়ি
চারদিকে তার কলরব ।

লোভী

সোহাগ তানভীর

এক কৃষক দুধের গরু পালন করে। গরুটি অনেক ভালো। প্রতিদিন অনেক দুধ দেয়। দুধ পেয়ে কৃষকের মন ভরে যায়। এ জন্য সে তার গরুকে অনেক ভালোবাসে। ভালো ভালো খাবার খাওয়ায়।

প্রতিদিন সকালে কৃষক মাঠে যাওয়ার আগে গোয়াল থেকে গরু আর বাছুর বের করে। পুকুরে নিয়ে যায়। গোসল করিয়ে নিয়ে এসে দুধ দোহন করে। দুধ দোহন করার সময় কৃষাণী বাছুর ধরে গরুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। মশা মাছি তাড়ায়।

একদিন সকালে কৃষক তার দুধের গরুটি গোয়াল ঘর থেকে বের করে। পুকুরে নিয়ে গোসল করিয়ে আনে।

গোসল করানোর পর গামছা দিয়ে গরুর শরীর থেকে পানি মুছে দেয়। কৃষাণী ঘর থেকে ছোট্ট বাটিতে সরিষার তেল, পিঁড়ি ও একটা বালতি নিয়ে আসে। কৃষক পিঁড়ির ওপর বসে। বাঁটে তেল মালিশ করে। বালতিটা উপযুক্ত জায়গায় রেখে বৃদ্ধাঙ্গুল এবং তর্জনী দিয়ে বাঁটে দেয় টান। কিন্তু এক ফোঁটাও দুধ বের হয় না। দুধ গেল কোথা! অপর বাঁট টানে। সেটা থেকেও দুধ বের হয় না। গরুর চারটা বাঁটের একটা বাঁটেও দুধ নেই।

পরের দিন দুধ দোহন করতে গিয়েও একই অবস্থা। কোন বাঁটেই দুধ নেই!

কৃষাণ-কৃষাণী দু'জনই চিন্তায় পড়ে যায়। দুধ গেল কই! গরু খাবার খায় ঠিক মত কিন্তু দুধ দেয় না কেন!

কোন অসুখ করলো না তো! কৃষক পশু ডাক্তার ডেকে আনে। ডাক্তার গরু দেখে। কিন্তু কোন রোগ খুঁজে পায় না। চিন্তায় দিশেহারা হয়ে যায়।

এক মাস চলে যায়, তবুও সমস্যার সমাধান হয় না। কৃষাণী বলে, হ্যাঁ গো, এমনও তো হইবার পারে, চোর আইসা রাতে দুধ চুরি করে লইয়ে যায়। তাই বলি কী, গোয়াল ঘরে সিসি ক্যামেরা লাগাও।

- চোর তো বোকা, গরু রাইখা দুধ চুরি করবো।

- তাও একটা সিসি ক্যামেরা লাগানোয় দোষ কী?

কৃষাণীর কথা মত কৃষক গোয়াল ঘরে সিসি ক্যামেরা লাগায়। রাতে গোয়ালে গরু রেখে ক্যামেরা চালু করে রাখে।

পরের সকালে সিসি টিভি ফুটেজে দেখে। গোয়াল ঘরের জানালার ফোকর দিয়ে একটা সাপ এসে গরুর বাঁট থেকে দুধ খেয়ে যায়।

কৃষাণ-কৃষাণী জেনে যায়, গরুর দুধ না পাওয়ার কারণ। দু'জন বুদ্ধি করে, লোভী সাপ আজ রাতেও আসবে। তখন দেখা যাবে মজা।

রাতে কৃষাণ-কৃষাণী দু'জনই জেগে থাকে। গোয়াল ঘরে আড়ালে লাঠি হাতে দু'জন দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। রাত যখন গভীর হয় তখন চুপিচুপি দুষ্ট সাপটা আসে। সেই গরুর বাঁটে মুখ লাগায় অমনি কৃষাণ কৃষাণী লাঠি দিয়ে সাপের মাথার ওপর আঘাত করে। এক আঘাতেই দুষ্ট সাপ চিৎপটাং।

লাঠির মাথায় করে সাপটা গোয়াল ঘরের বাহিরে বের করে আনে কৃষক। বলে, লোভে পাপ। পাপে মৃত্যু।

নির্ধারিত এ ফরম ছাড়া 'বলতে পারো'র উত্তর দেয়া যাবে না

উত্তরকারীর ঠিকানা

নাম : .....

বর্তমান ঠিকানা : .....

.....

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : .....

শ্রেণী : ..... বর্ষ/বিভাগ : ..... রোল : .....

ফোন : ..... থানা ও জেলা : .....

১. .....

২. .....

৩. .....

৪. .....

৫. .....

৬. .....

৭. .....

৮. .....

৯. .....

১০. .....

উত্তর পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০

নির্ধারিত এ ছক ছাড়া 'শব্দ ধাঁধা'র সমাধান গ্রহণ করা হবে না

সমাধানকারীর ঠিকানা

নাম : .....

বর্তমান ঠিকানা : .....

.....

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : .....

শ্রেণী : ..... বর্ষ/বিভাগ : ..... রোল : .....

ফোন : ..... থানা ও জেলা : .....

সেপ্টেম্বর ২০২০ সংখ্যার শব্দধাঁধা

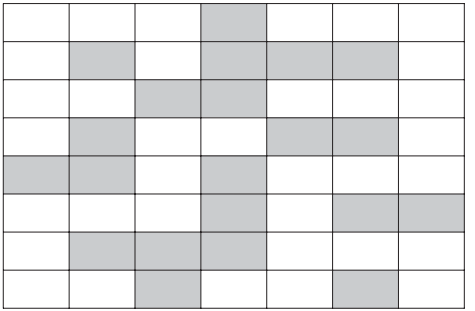

বলতে পারো এবং শব্দ ধাঁধার উত্তর মাঝে কেটে পাঠাও

সমাধান পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০

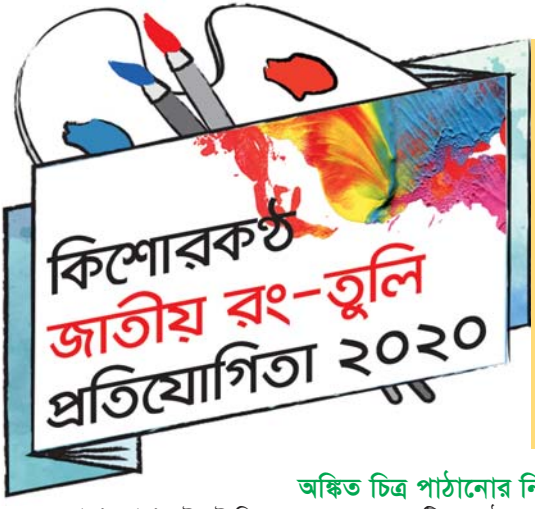

শিশু-কিশোরদের সৃজনশীল শিল্পসত্তাকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সর্বাধিক প্রচারিত শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা কিশোরকণ্ঠ আয়োজন করেছে কিশোরকণ্ঠ জাতীয় রং-তুলি প্রতিযোগিতা ২০২০। আগ্রহী শিশু-কিশোরদের নিকট থেকে তাদের চিত্রাঙ্কন নিচে দেওয়া নিয়মানুযায়ী পত্রিকার ঠিকানায় পাঠানোর আহবান করা হচ্ছে।

অঙ্কিত চিত্র পাঠানোর নিয়ম :

১. 'ক' ও 'খ'-এই দুই বিভাগের যেকোনো একটিতে পাঠাতে হবে।
ক-বিভাগ : প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি
খ-বিভাগ : ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি

২. চিত্রের সাথে জন্ম নিবন্ধনপত্রের ফটোকপি/স্ক্যানকপি এবং দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি পাঠাতে হবে।

৩. চিত্র অবশ্যই নিজ হাতে আঁকা হতে হবে এবং কোন ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার করা যাবে না।

৪. ইতিপূর্বে দেশী/বিদেশী যেকোনো পত্রিকা, অনলাইন (যেমন : ফেসবুক, ওয়েবম্যাগ, ব্লগ) বা বইতে প্রকাশিত চিত্র এই প্রতিযোগিতার জন্য বিবেচিত হবে না।

৫. ই-মেইল, ফেসবুক পেজের মেসেজ অপশন অথবা ডাকযোগে চিত্র পাঠানো যাবে। ই-মেইলে ও ফেসবুক পেজের মেসেজ অপশনে পাঠানোর ক্ষেত্রে চিত্রটি স্ক্যান করে পাঠাতে হবে।

৬. ইমেইলের ক্ষেত্রে সাবজেক্টের ঘরে এবং ডাকে পাঠানোর ক্ষেত্রে খামের ওপর 'কিশোরকণ্ঠ জাতীয় রং-তুলি প্রতিযোগিতা ২০২০' কথাটি উল্লেখ করতে হবে।

৭. অঙ্কিত চিত্র পাঠাবার শেষ তারিখ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০।

৮. দুইটি বিভাগে পাঁচজন করে মোট দশজনকে পুরস্কৃত করা হবে।
প্রথম পুরস্কার : ১২,০০০/- (বারো হাজার টাকা), সনদপত্র ও ক্রেস্ট।
দ্বিতীয় পুরস্কার : ১০০০০/- (দশ হাজার টাকা), সনদপত্র ও ক্রেস্ট।
তৃতীয় পুরস্কার : ৮০০০/- (আট হাজার টাকা), সনদপত্র ও ক্রেস্ট।
চতুর্থ পুরস্কার : ৭০০০/- (সাত হাজার টাকা), সনদপত্র ও ক্রেস্ট।
পঞ্চম পুরস্কার : ৫০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা), সনদপত্র ও ক্রেস্ট।

৯. পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলো কিশোরকণ্ঠ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবে। এছাড়া বিচারকমণ্ডলী কর্তৃক মনোনীত আরও দশজন প্রতিযোগীর সেরা দশটি চিত্রও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে।

১০. যেকোনো বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

অঙ্কিত চিত্র পাঠানোর ঠিকানা :
নতুন কিশোরকণ্ঠ, ৫১, ৫১/এ (৭ম তলা), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল : kishorkantha@yahoo.com
ফেসবুক পেজ : https://www.facebook.com/kishorkanthabd/